যকের ধন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

যকের ধন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

eBook Created By: **Sisir Suvro**

Need More Books!

Gooo...

www.shishukishor.org

www.amarboi.com

www.banglaepub.com

www.boierhut.com/group

মড়ার মাথা

ঠাকুরদাদা মারা গেলে পর, তার লোহার সিন্দুকে অনান্য জিনিসের সঙ্গে একটি ছোট বাক্স পাওয়া গেল। সে বাক্সের ভিতরে নিশ্চয়ই কোন দামী জিনিস আছে মনে করে মা সেটি খুলে ফেললেন। কিন্তু তার মধ্যে পাওয়া গেল শুধু একখানা পুরানো পকেট-বুক, আর একখানা ময়লা-কাগজে-মোড়া কি একটা জিনিস। মা কাগজটা খুলেই জিনিসটা ফেলে দিয়ে হাউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, কি, কি হল মা?

মা ভয়ে কাপতে কাঁপতে মাটির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'কুমার, শীগগীর ওটা ফেলে দে।

আমি হেঁট হয়ে চেয়ে দেখলুম, একটা মড়ার মাথার খুলি মাটির উপর পড়ে রয়েছে। আশ্চর্য হয়ে বললুম, লোহার সিন্দুকে মড়ার মাথা। ঠাকুরদা কি বুড়ো-বয়সে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন?

মা বললেন, ওটা ফেলে দিয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করবি চল।

মড়ার মাথার খুলিটা জানলা গলিয়ে আমি বাড়ীর পাশের একটা খানায় ফেলে দিলুম। পকেট-বুকখানা ঘরের একটা তাকের উপর তুলে রাখলুম। মা বাক্সটা আবার সিন্দুকে পুরে রাখলেন ।...

দিন-কয়েক পরে পাড়ার করালী মুখুয্যে হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। করালী মুখুয্যেকে আমাদের বাড়ীতে দেখে আমি ভারি অবাক হয়ে গেলুম। কারণ আমি জানতুম যে ঠাকুরদাদার সঙ্গে তার একটুকুও বনিবনাও ছিল না, তিনি বেঁচে থাকতে করালীকে কখনো আমাদের বাড়ীতে ঢুকতে দেখিনি।

করালীবাবু বললেন, 'কুমার, তোমার মাথার ওপরে এখন আর কোন অভিভাবক নেই। তুমি নাবালক। হাজার হোক তুমি তো আমাদেরই পাড়ার ছেলে। এখন আমাদের সকলেরই উচিত, তোমাকে সাহায্য করা। তাই আমি এসেছি।

করালীবাবুর কথা শুনে বুঝলুম তাকে আমি যতটা খারাপ লোক বলে ভাবতুম, আসলে তিনি ততটা খারাপ লোক নন। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললুম, 'যদি কখনো দরকার হয়, আমি আপনার কাছে আগে যাব।'

করালীবাবু বসে বসে এ-কথা সে-কথা কইতে লাগলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাকে বললুম, ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকে একটা ভারি মজার জিনিস পাওয়া গেছে।

করালীবাবু বললেন, কি জিনিস

আমি বললুম, একটা চন্দন-কাঠের বাক্সের ভেতরে ছিল একটা মড়ার মাথার খুলি—

করালীবাবুর চোখ দুটো যেন দপ করে জ্বলে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, মড়ার মাথার খুলি?

—হ্যাঁ, আর একখানা পকেট-বই।

—সে বাক্সটা এখন কোথায়?

—লোহার সিন্দুকেই আছে।

করালীবাবু তখনই সে কথা চাপা দিয়ে অন্ত কথা কইতে লাগলেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝলুম, তিনি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। খানিক পরে তিনি চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শুনলাম আমার কুকুর বাঘা ভয়ানক চীৎকার করছে। বিরক্ত হয়ে দু-চারবার ধমক দিলুম, কিন্তু আমার সাড়া পেয়ে বাঘার উৎসাহ আরো বেড়ে উঠল— সে আরো জোরে চেঁচাতে লাগল।

তারপরেই, যেন কার পায়ের শব্দ পেলুম। কে যেন তুড়-দুড় করে ছাদের উপর দিয়ে চলে গেল। ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। চারিদিকে খোঁজ করলুম, কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলুম না। ভাবলুম আমারি ভ্রম। বাঘার গলার শিকল খুলে দিয়ে, আবার ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম।

সকালবেলায় ঘুম ভেঙেই শুনি মা ভারি চ্যাঁচামেচি লাগিয়েছেন। বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি মা?

মা বললেন, ওরে কাল রাত্তিরে বাড়ীতে চোর এসেছিল।

তাহলে কাল রাত্রে যা শুনেছিলুম তা ভুল নয়।

মা বললেন, দেখবি আয়, বড় ঘরে লোহার সিন্দুক খুলে রেখে গেছে।

ঘরে গিয়ে দেখি সত্যিই তাই! কিন্তু চোর বিশেষ কিছু নিয়ে যেতে পারেনি—কেবল সেই চন্দন-কাঠের বাক্সটি ছাড়া।

কিন্তু মনে কেমন একটা ধোকা লেগে গেল! সিন্দুকে এত জিনিস থাকতে চোর খালি সেই বাক্সটা নিয়ে গেল কেন? আরো মনে পড়ল, কাল সকালে এই বাক্সের কথা শুনেই করালীবাবু কিরকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তবে কি এই বাক্সের মধ্যে কোন রহস্য আছে? সম্ভব। নইলে, একটা মড়ার মাথার খুলি কে আর এত যত্ন করে লোহার সিন্দুকের ভিতরে রেখে দেয়?

মাকে কিছু না বলেই তাড়াতাড়ি বাইরে ছুটলুম। বাড়ীর পাশের খানাটার মুখে গিয়ে দেখলুম, মড়ার মাথার খুলিট একরাশ জঞ্জালের উপরে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। সেটাকে আর একবার পরখ করবার জন্যে তুলে নিলুম। খুলির একপিঠে গাঢ় কালো রং মাখানে ছিল—কিন্তু খানার জল লেগে মাঝে মাঝে রং উঠে গেছে! আর যেখানেই রং নেই, সেইখানেই আঁকের মতন কি কতকগুলো খোদা রয়েছে। অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে খুলিটাকে লুকিয়ে আবার বাড়ীতে আনলুম। সাবান-জলে সেটাকে বেশ করে ধুয়ে ফেলতেই কালে রং উঠে গেল। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখলুম, খুলির একপিঠের সবটায় কে অনেকগুলো অঙ্ক খুদে রেখেছে। অঙ্কগুলো এই রকম:

৩৬ (২)
১৭ (২)

---

(৯) ৩০
৫
(৯) ৪০
৩৯

---

(৩) ৩৩
৩৯
(৯) ৩২
৪৪
৩৯
৪০
১৫ (২)
১৯

৩৭
৫
৪০
(৯) ৩০
৪২

---

(৯) ২৯
(৯) ১৩

৩৩
৫
৩৫
(৩) ৩০
(৯) ১৩

৩০
৪২
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮

---

২৯ (২)
৩৭
(৯) ৩৫

---

২৫ (২)
৩
(৯) ৩২
২
২৩
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮
৩৫
৫
৩০
৩১
(৯) ৩০
৩৫

---

৩৫ (২)
(৯) ৩৭

১৯
৪৮
১৫
২০

৯
(৩) ১৫
(৯) ৪৮

---

(৩) ২৮
৩২
১৪ (২)
৩২ (২)

---

৩৩ (২)
২৯
৩৯

---

২৮ (২)
৩৯

২৮
৪০ (২)
৪৮

---

৪৪ (২)
২৮
৪৫ (২)
২৮

২০
(৩) ৩৭

৫২
১৪
৫
৪৬
(৯) ৪০

৩৩
২৯

---

৩৩ (২)
(৯) ৩৫

যকের ধন

এই অদ্ভুত অঙ্কগুলোর মানে কি? অনেক ভাবলুম, কিন্তু মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ মনে পড়ল ঠাকুরদাদার পকেট-বইয়ের কথা। সেখানাও তো এই খুলির সঙ্গে ছিল, তার মধ্যে এই রহস্যের কোন সদুত্তর নেই কি?

তখনি উপরে গিয়ে তাক থেকে পকেট-বইখানা পাড়লুম। খুলে দেখি, তার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত লেখায় ভরতি। গোড়ার দিকের প্রায় ষোল-সতেরো পাতা পড়লুম, কিন্তু সেসব বাজে কথা। তারপর হঠাৎ এক জায়গায় দেখলুম;

'১৯২০ সাল, আশ্বিন মাস —আসাম থেকে ফেরবার মুখে একদিন আমরা এক বনের ভিতর দিয়ে আসছি। সন্ধ্যা হয়-হয়—আমরা এক উঁচু পাহাড়ে-জমি থেকে নামছি। হঠাৎ দেখি খানিক তফাতে একটা মস্ত-বড় বাঘ। সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে যেন কার উপরে লাফিয়ে পড়বার জন্যে তাক করছে –আরো একটু তফাতে দেখলুম, একজন সন্ন্যাসী পথের পাশে, গাছের তলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। বাঘটার লক্ষ্য তাঁর দিকেই!

আমি তখনি চীৎকার করে উঠলুম। আমার সঙ্গের কুলিরাও সে চীৎকারে যোগ দিল। সন্ন্যাসীর ঘুম ভেঙে গেল, বাঘটাও চমকে ফিরে আমাদের দেখে একলাফে অদৃশ্য হল।

সন্ন্যাসী জেগে উঠেই ব্যাপারটা সব বুঝে নিলেন। আমার কাছে এসে কৃতজ্ঞ স্বরে বললেন, 'বাবা, তোমার জন্যে আজ আমি বাঘের মুখ থেকে বেঁচে গেলুম?

আমি বললুম, ঠাকুর, বনের ভেতরে এমনি করে কি ঘুমোতে আছে?

সন্ন্যাসী বললেন, বনই যে আমাদের ঘর-বাড়ী বাবা?

আমি বললুম, কিন্তু এখনি আপনার প্রাণ যেত!

সন্ন্যাসী বললেন, 'কৈ বাবা, গেল না তো। ভগবান ঠিক সময়েই তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

শুনলুম, আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সন্ন্যাসীও সেই দিকে যাবেন। তাই সন্ন্যাসীকেও আমরা সঙ্গে নিয়ে চললুম।

সন্ন্যাসী দুদিন আমাদের সঙ্গে রইলেন। আমি যথাসাধ্য তাঁর সেবা করতে ত্রুটি করলুম না। তিন দিনের দিন বিদায় নেবার আগে তিনি আমাকে বললেন, 'দেখ বাবা, তোমার সেবায় আমি বড় তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার প্রাণ রক্ষেও করেছ। যাবার আগে আমি তোমাকে একটি সন্ধান দিয়ে যেতে চাই।'

আমি বললুম, কিসের সন্ধান?

সন্ন্যাসী বললেন, 'যকের ধনের!'

আমি আগ্রহের সঙ্গে বললুম, যকের ধন! সে কোথায় আছে ঠাকুর?

সন্ন্যাসী বললেন, খাসিয়া পাহাড়ে।

আমি হতাশভাবে বললুম, কোনখানে আছে আমি তা জানব কেমন করে?

সন্ন্যাসী বললেন, আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি। খাসিয়া পাহাড়ের রূপনাথের গুহার নাম শুনেছ?

আমি বললুম, শুনেছি। প্রবাদ আছে যে, এই গুহার ভেতর দিয়ে চীনদেশে যাওয়া যায়, আর অনেক কাল আগে এক চীন-সম্রাট এই গুহাপথে নাকি সসৈন্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, হ্যাঁ এই রূপনাথের গুহা থেকে পঁচিশ ক্রোশ পশ্চিমে গেলে, উপত্যকার মাঝখানে একটি সেকেলে মন্দির দেখতে পাবে। সে মন্দির এখন ভেঙে পড়েছে, কিছুদিন পরে তার কোন চিহ্নও হয়তো আর পাওয়া যাখে না। একসময়ে এখানে মস্ত এক মঠ ছিল, তাতে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা থাকতেন। সেকালের এক রাজা বিদেশী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করার আগে এই মঠে নিজের

সমস্ত ধন-রত্ন গচ্ছিত রেখে যান। কিন্তু যুদ্ধে তার হার হয়। পাছে নিজের ধন-রত্ন শত্রুর হাতে পড়ে, এই ভয়ে রাজা সে সমস্ত এক জায়গায় লুকিয়ে এক যককে পাহারায় রেখে পালিয়ে যান। তারপর তিনি আর ফিরে আসেননি। সেই ধন-রত্ন এখনো সেইখানেই আছে—তারপর সন্ন্যাসী আমাকে বৌদ্ধমঠে যাবার পথের কথা ভালো করে বলে দিলেন।

আমি বললুম, কিন্তু এতদিন আর কেউ যদি সেই ধন-রত্নের সন্ধান পেয়ে থাকে?

সন্ন্যাসী বললেন, কেউ পায়নি। সে বড় দুর্গম দেশ, সেখানে যে বৌদ্ধমঠ আছে, তা কেউ জানে না, আর কোন মানুষও সেখানে যায় না। মঠে গেলেও, সারা জীবন ধরে ধন-রত্ন খুঁজলেও কেউ পাবে না। কিন্তু তোমাকে সেখানে গিয়ে খুঁজতে হবে না; ধন-রত্ন ঠিক কোনখানে পাওয়া যাবে, তা জানবার উপায় কেবল আমার কাছে আছে ? এই বলে সন্ন্যাসী তার ঝোলা থেকে একটি মড়ার মাথার খুলি বার করলেন ।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, ‘ওতে কি হবে ঠাকুর : সন্ন্যাসী বললেন, যে যক ধন-রত্নের পাহারায় আছে, এ তারই খুলি। এই খুলিতে আমি মন্ত্র পড়ে দিয়েছি, এ খুলি যার কাছে থাকবে যক তাকে আর কিছুই বলবে না। খুলিতে এই যে অঙ্কের মত রেখা রয়েছে, এ হচ্ছে সাঙ্কেতিক ভাষা। এই সঙ্কেত বুঝবার উপায়ও আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, তাহলেই তুমি জানতে পারবে কোনখানে ধন-রত্ন আছে?—এই বলে সন্ন্যাসী আমাকে সঙ্কেত বুঝবার গুপ্ত উপায় বলে দিলেন।

তারপর এক বৎসর ধরে অনেক ভাবলুম। কিন্তু একলাটি সেই দুর্গম দেশে যেতে ভরসা হল না। শেষটা আমার প্রতিবেশী করালীকে বিশ্বাস করে সব কথা জানিয়ে বললুম, ‘করালী, তোমার জোয়ান বয়স, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, তবে তোমাকেও ধন-রত্নের অংশ দেব।’

কিন্তু করালী যে বেইমান, আমি তা জানতুম না। সে ফাঁকি দিয়ে মড়ার মাথার খুলিটা আমার কাছ থেকে আদায় করবার চেষ্টায় রইল। দু-একবার লোক লাগিয়ে চুরি করবার চেষ্টাও করেছিল, কিন্তু পারেনি। ভাগ্যে আমি তাকে যকের ধনের ঠিকানাটা বলে দিইনি।

কিন্তু খাসিয়া-পাহাড়ে যাবার আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। এই বুড়োবয়সে টাকার লোভে একলা সেই অজানা দেশে গিয়ে শেষটা কি বাঘ-ভাল্ল ক-ডাকাতের পাল্লায় প্রাণ খোয়াব? অন্য কারুকেও সঙ্গে নিতে ভরসা হয় না,—কে জানে, টাকার লোভে বন্ধুই আমাকে খুন করবে কি না।

তবে, এই পকেট-বইয়ে আমি সব কথা লিখে রাখলুম। ভবিষ্যতে এই লেখা হয়তো আমার বংশের কারুর উপকারে আসতে পারে। কিন্তু আমার বংশের কেউ যদি সত্যিই সে বৌদ্ধমঠে যাত্রা করে, তবে যাবার আগে যেন বিপদের কথাটাও ভালো করে ভেবে দেখে। এ কাজে পদে পদে প্রোণের ভয়।'

পকেট-বইখানা হাতে করে আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম।

সঙ্কেতের অর্থ

উঃ! করালীবাবু কি ভয়ানক লোক! ঠাকুরদাদার সঙ্গে সে চালাকি করতে গিয়েছিল, কিন্তু পেরে ওঠেনি। তারপর এতদিনেও আশা ছাড়েনি। আমি বেশ বুঝলুম, এই মড়ার মাথাটা কোথায় আছে তা জানবার জন্যেই করালী কাল আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হয়েছিল। রাত্রে এইটে চুরি করবার ফিকিরেই যে আমাদের বাড়ীতে চোর এসেছিল, তাতেও আর কোন সন্দেহ নেই। ভাগ্যে মড়ার মাথাটা আমি বাড়ীর পাশের খানায় ফেলে দিয়েছিলুম।

এখন কি করা উচিত? গুপ্তধনের চাবি তো এই খুলির মধ্যেই আছে, কিন্তু অনেকবার উল্টেপাল্টে দেখেও আমি সেই অঙ্কগুলোর ল্যাজা-মুড়ে। কিছুই বুঝতে পারলুম না। পকেট-বইখানার প্রত্যেক পাতা উল্টে দেখলুম, তাতেও ঠাকুরদাদা এই সঙ্কেত বুঝবার কোন উপায় লিখে রাখেননি। ঠাকুরদাদার উপরে ভারি রাগ হল। আসল ব্যাপারটিই জানবার উপায় নেই!

তারপর ভেবে দেখলুম, জেনেই বা কি আর এমন হাতী-ঘোড়া লাভ হ ! আমার বয়স সতেরো বৎসর। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি। জীবনে কখনো কলকাতার বাইরে যাইনি। কোথায় কোন কোণে আসাম আর খাসিয়া পাহাড়, আবার তার ভিতরে কোথায় আছে 'রূপনাথের গুহা'—এসব খুঁজে বার করাই তো আমার পক্ষে অসম্ভব। তার উপরে সেই গভীর জঙ্গল, যেখানে দিনরাত বাঘভালুক-হাতীর হানা দিচ্ছে। সেকেলে এক বৌদ্ধমঠ, তার ভিতরে যকের ধন—সেও এক ভুতুড়ে কাণ্ড! শেষটা কি একলা সেখানে গিয়ে আলিবাবার ভাই কাসিমের মতন টাকার লোভে প্রাণটা খোয়াব? এসব ভেবেও বুকটা ধুকপুক করে উঠল।

হঠাৎ মনে হল বিমলের কথা। বিমল আমার প্রাণের বন্ধু, আমাদের পাড়ার ছেলে। আমার চেয়ে সে বয়সে বছর তিনেকের বড়, এ বৎসর বি-এ দেবে। বিমলের মত চালাক ছেলে আমি আর তুটি দেখিনি। তার গায়েও অসুরের মতন জোর, রোজ সে কুস্তি লড়ে-দুশে ডন, তিনশো বৈঠক দেয়। তার উপরে এই বয়সেই সে অনেক দেশ বেড়িয়ে এসেছে—এই গেল বছরেই তো আসামে বেড়াতে গিয়েছিল। তার কাছে আমি কোন কথা লুকোতুম না। ঠিক করলুম, যাওয়া হোক আর নাই হোক একবার বিমলকে এই মড়ার মাথাটা দেখিয়ে আসা যাক।

বৈকালে বিমলের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলুম-তখন সে বসে বসে বন্দুকের নল সাফ করছিল! আমাকে দেখে বললে, কিহে, কুমার যে ! কি মনে করে?

আমি বললুম, একটা ধাঁধা নিয়ে ভারি গোলমালে পড়েছি ভাই!

বিমল বললে, কি ধাঁধা?

আমি মড়ার মাথার খুলিটা বার করে বললুম, এই দেখ?

বিমল অবাক হয়ে খুলিটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে, এ আবার কি?

আমি পকেট-বইখান তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম, আমার ঠাকুরদার পকেট-বই। পড়লেই সব বুঝতে পারবে?

বিমল বললে, আচ্ছা রোসে, আগে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা সাফ করে নি। কাল পাখি-শিকারে গিয়েছিলুম। বন্দুকে ভারি ময়লা জমেছে?

বন্দুক সাফ করে, হাত ধুয়ে বিমল বললে, ব্যাপার কি বল দেখি কুমার? তুমি কি কোন তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছ? তোমার হাতে মড়ার মাথা কেন?

আমি বললুম, আগে পকেট-বইখানা পড়েই দেখ না –

'বেশ' বলে বিমল পকেট-বইখানা নিয়ে পড়তে লাগল। খানিক পরেই দেখলুম, বিমলের মুখ বিস্ময়ে আর কৌতুহলে ভরে উঠছে!

পড়া শেষ করেই বিমল তাড়াতাড়ি মড়ার মাথাটা তুলে নিয়ে সেটাকে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, ভারি আশ্চর্য তো?

আমি বললুম, অঙ্কগুলো কিছু বুঝতে পারলে?

বিমল বললে, উঁহু?

—আমিও পারিনি।

—কিন্তু আমি এত সহজে ছাড়ব না। তুমি এখন বাড়ী যাও, কুমার! খুলিট। আমার কাছেই থাক। আমি এটার রহস্য জানবই জানব। তুমি কাল সকালে এস।

আমি বললুম, কিন্তু সাবধান!

বিমল বললে, কেন?

আমি বললুম, কেরালী মুখুয্যে এই খুলিট চুরি করবার জন্যে কাল আবার হয়তো তোমাদের বাড়ীতে মাথা গলাবে।

—আমি এত সহজে ঠকবার ছেলে নই হে?

—তা আমি জানি। তবু সাবধানের মার নেই। এই বলে আমি চলে এলুম।

পরের দিন ভোর না-হতেই বিমলের কাছে ছুটলুম। তার বাড়ীতে আমার অবারিত দ্বার। একেবারে তার পড়বার ঘরে গিয়ে দেখি, বিমল টেবিলের উপরে হেঁট হয়ে একমনে কি লিখছে, আর সামনেই মড়ার মাথাটা পড়ে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দে চমকে তাড়াতাড়ি সে খুলিটাকে তুলে নিয়ে লুকিয়ে ফেলতে গেল— তারপর আমাকে দেখে আশ্বস্ত হয়ে হেসে বললে, ও, তুমি ! আমি ভেবেছিলুম অন্য কেউ?

—কাল তো অত সাহস দেখালে, আজ এত ভয় পাচ্ছ কেন?

—কাল? কাল সবটা ভালো করে তলিয়ে বুঝিনি। আজ বুঝছি, আমাদের এখন সাবধান হয়ে কাজ করতে হবে—কাক-পক্ষী যেন টের না পায়?

—অঙ্কগুলো দেখে কি বুঝলে?

—যা বোঝা উচিত, সব বুঝেছি।

আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম, সব বুঝতে পেরেছ! সত্যি?

বিমল বললে, চুপ! চেঁচিয়ে না ! কে কোথায় শুনতে পাবে বলা যায় না। ঠাণ্ডা হয়ে ঐখানে বোসো।

আমি একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললুম, খুলিতে কি লেখা আছে, আমাকে বল।

বিমল আস্তে আস্তে বললে, প্রথমটা আমিও কিছু বুঝতে পারিনি। প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টা করে যখন একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছি, তখন হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগে একখানা ইংরিজী বই পড়েছিলুম। তাতে নানারকম সাঙ্কেতিক লিপির গুপ্তরহস্য বোঝানো ছিল। তাতেই পড়েছিলুম যে ইউরোপের চোর ডাকাতরা প্রায়িই একরকম সঙ্কেত ব্যবহার করে। তারা Alphabet অর্থাৎ বর্ণমালাকে যথাক্রমে সংখ্যা অর্থাৎ ১, ২, ৩ হিসাবে ধরে। অর্থাৎ one হবে A, two হবে B, three হবে C ইত্যাদি। আমি ভাবলুম হয়তো এই খুলিটাতেও সেই নিয়মে সঙ্কেত সাজানো হয়েছে। তারপর দেখলুম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। তখন এই সঙ্কেতগুলো খুব সহজেই পড়ে ফেললুম।

আমি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠলুম, পড়ে কি বুঝলে বল?

বিমল আমার হাতে একখানা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললে, খুলির সঙ্কেতগুলো ছাবিবশটা ঘরে ভাগ করা । আমিও লেখাগুলো সেই ভাবেই সাজিয়েছি?

কাগজের উপরে এই কথাগুলো লেখা ছিল ; 'ভাঙা দেউলের পিছনে সরলগাছ মূলদেশ থেকে পূবদিকে দশগজ এগিয়ে থামবে ডাইনে আটগজ এগিয়ে বুদ্ধদেব। বামে ছয়গজ এগিয়ে তিনখান। পাথর তার তলায় সাতহাত জমি খুড়লে পথ পাবে?'

আমি চিঠিখানা পড়ে মনে মনে বিমলের বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলুম।

বিমল বললে, 'সাঙ্কেতিক লিপিটা তোমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দি, শোনো। আমাদের বাংলা ভাষায় 'অ' থেকে শুরু করে ঁ পর্যন্ত বাহান্নটি বর্ণ। সেই বর্ণগুলিকে ১, ২, ৩ হিসাবে যথাক্রমে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ ১ হচ্ছে অ, ২ হচ্ছে আ, ১৩ হচ্ছে ক, ৫২ হচ্ছে ঁ প্রভৃতি।

যেখানে 'অ'-কার বা 'এ'-কার প্রভৃতি আছে, সেখানে বর্ণের যেপাশে দরকার, সেই পাশে ব্রাকেটের ভেতর সংখ্যা লেখা হয়েছে। উদাহরণ দেখ ;— 'ভ' বর্ণের সংখ্যা ৩৬, আর 'আ'-কারের সংখ্যা হচ্ছে ২। অতএব, ৩৬ (২) সঙ্কেতে বুঝতে হবে 'ভা'। 'দ' বর্ণের সংখ্যা ৩০, 'এ'-কারের সংখ্যা হচ্ছে ৯। অতএব দে' বোঝাতে লিখতে হবে (১) ৩০। 'উ'কার বর্ণের তলায় বসে। সুতরাং ও ৩৫/৫ থাকলে বুঝতে হবে 'বু'। 'উ'র মত 'উ-কারের সংখ্যাও হচ্ছে ৫। চন্দ্রবিন্দুর সংখ্যা বাহান্ন, চন্দ্রবিন্দু উপরে বসে, কাজেই 'খুঁ'র সঙ্কেত ৫২/১৪/৫ যুক্ত-অক্ষরকে আলাদা করে ধরা হয়েছে, যেমন— বুদ্ধদেব। যিনি এই সংখ্যাগুলি লিখেছেন, তার বানান-জ্ঞান ততটা টনটনে নয়। কেননা 'মূল' ও 'পূব তার হাতে পড়ে হয়েছে—'মুল' ও 'পুব'। উ-র মত ঊ-কারের সংখ্যা হচ্ছে ৬। কিন্তু তিনি উ-কারের সংখ্যা উ-কারের ৬-এর স্থানে বসিয়েছেন— বর্ণের তলাকার ব্রাকেটে।

আমি মড়ার মাথার খুলিটা আর একবার পরখ করবার জন্যে তুলে নিলুম–কিন্তু দৈবগতিকে হঠাৎ সেখান ফসকে মার্বেল বাঁধানে মেঝের উপরে সশব্দে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেটা উঠিয়ে নিয়ে, তার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে আমি বলে উঠলুম, 'ঐ: যাঃ! খুলিটার খানিকট চটে গিয়েছে?

বিমল বললে, কোনখানটা?

আমি বললুম, গোড়ার চারটে ঘর-ভাঙা দেউলের পিছনে সরলগাছ—পর্যন্ত!

বিমল বললে, এই কাণ্ডটি যদি আগে ঘটত, তাহলে সমস্তই মাটি হয়ে যেত। যাক, তোমার কোন ভয় নেই,—সঙ্কেতগুলো আমি কাগজে টুকে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের সাবধান হতে হবে, অঙ্কগুলো রেখে কথাগুলো এখনি নষ্ট করে ফেলাই উচিত,—এই বলে সে সঙ্কেতের অর্থ-লেখা কাগজখান টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেললে। যখন দরকার হবে, পাঁচ মিনিটের চেষ্টাতেই সঙ্কেতের অর্থ আমরা ঠিক বুঝতে পারব,–কিন্তু বাইরের কোন লোক খুলির সঙ্কেত দেখে কিছুই ধরতে পারবে না!

সর্বনাশ

আমি বললুম, 'বিমল, সঙ্কেতের মানে তো বোঝা গেল, এখন আমরা কি করব?

বিমল বাধা দিয়ে বললে, এতে আর কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই কুমার,—আমাদের যেতেই হবে! এতবড় একটা অদ্ভুত ব্যাপার, এর শেষ পর্যন্ত না দেখলে আমার তৃপ্তি হচ্ছে না।

আমি বললুম, আমাদের সঙ্গে কে কে যাবে?

—কেউ না। খালি তুমি আর আমি।

—কিন্তু সে বড় দুর্গম জায়গা। লোকজন না নিয়ে কি যাওয়া উচিত?

বিমল বললে, কিছুই দুর্গম নয়, পথঘাট আমি সব চিনি, 'রূপনাথের গুহা' পর্যন্ত ঠিক যাব। তারপরের পথ কিরকম জানি না বটে, কিন্তু চিনে নিতে বেশী দেরি লাগবে না। তুমি বুঝি বিপদের ভয় করছ? ও-ভয় কোরো না। বিপদকে ভয় করলে মানুষ আজ এত বড় হতে পারত না। সোজা পথ দিয়ে তো শিশুও যেতে পারে, তাতে আর বাহাদুরি কি? বিপদের অগ্নিপরীক্ষায় হাসিমুখে যে সফল হয়, পৃথিবীতে তাকেই বলি মানুষের মত মানুষ!

আমি বললুম, কিন্তু গোঁয়ার্তুমি করে প্রাণ দিলে মানুষের মর্যাদা কি বাড়বে? আমি অবশ্য কাপুরুষ নই—তুমি যেখানে বল যেতে রাজি আছি! তবে অন্ধের মত কিছু করা ঠিক নয়—জানো তো, প্রবাদেই আছে—'লাফ মারবার আগে চেয়ে দেখ'।

বিমল বললে, 'যা ভাববার আমি সব ভেবে দেখেছি, এখন আর ভাবনা নয়।'

—কবে যাবে?

—আমি তো প্রস্তুত। কাল বল কাল, পরশু বল পরশু।

—এত তাড়াতাড়ি! যাবার আগে বন্দোবস্ত করতে হবে তো?

—বন্দোবস্ত করব আর ছাই! আমরা তো সেখানে ঘরসংসার পাততে যাচ্ছি না–এসব কাজে যতটা ঝাড়া-হাত-পায়ে যাওয়া যায়, ততই ভালো। গোটা-দুই ব্যাগ, আর আমরা জুটি প্রাণী—ব্যস?

—কোন পথে যাবে?

বিমল বললে, আমাদের কামরূপ পার হয়ে এই খাসিয়াপাহাড়ে উঠতে হবে। খাসিয়া-পাহাড়ের ঠিক পাশেই যমজ ভাইয়ের মত আর একটি পাহাড় আছে—তার নাম জয়ন্তী। এদের উপরে আছে—কামরূপ আর নবগ্রাম। পূর্বে আছে উত্তর-কাছাড়, নাগাপর্বত আর কপিলী নদী। দক্ষিণে আছে শ্রীহট্ট, আর পশ্চিমে গারো-পাহাড়।

—খাসিয়া-পাহাড় কি খুব উঁচু?

—হুঁ, উঁচু বৈকি! কোথাও চার হাজার, কোথাও পাঁচ হাজার, আবার কোথাও বা সাড়ে ছয় হাজার ফুট উঁচু। পাহাড়ের ভেতর অনেক জলপ্রপাত আছে—তাদের মধ্যে চেরাপুঞ্জি নামে জায়গার কাছে 'মুসমাই' আর শিলং শহরের কাছে 'বীডনস প্রপাত দুটিই বড়। প্রথমটির উচ্চতা এক হাজার আটশো ফুট, দ্বিতীয়টি ছয়শো ফুট উচ্চতায় প্রথম প্রপাতটি পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয়। পাহাড়ের মধ্যে উষ্ণ প্রস্রবণও আছে—তার জল গরম। খাসিয়াপাহাড়ে শীত আর বর্ষ ছাড়া আর কোন ঋতুর প্রভাব বোঝা যায় না—বৃষ্টি আর ঝড় তো লেগেই আছে। বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠমাসে বৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত একটু বসন্তের আমেজ পাওয়া যায়। খাসিয়াপাহাড়ের চেরাপুঞ্জি তো বৃষ্টির জন্যে বিখ্যাত।'

বিমল হেসে বললে, 'খালি বাঘ-ভালুক কেন, সেখানকার জঙ্গলে হাতী, গণ্ডার, বুনো মোষ আর বরাহ সবই পাওয়া যায়, কিন্তু সাপ খুব কম?

আমি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, তবেই তো।

বিমল আমার পিঠ চাপড়ে বললে, কুমার, তুমি কলকাতার বাইরে কখনো যাওনি বলে বন-জঙ্গলকে যতটা ভয়ানক মনে করছ, আসলে তা তত ভয়ানক নয়। আর আমি সঙ্গে থাকব—তোমার ভয় কি? জানো তো, আমি এই বয়সেই ঢের বড় জন্তু শিকার করেছি। আমার দুটো বন্দুকের পাশ আছে-একটা তোমাকে দেব। তুমি আজও কিছু শিকার করনি বটে, কিন্তু আমি তো তোমাকে অনেকদিন আগেই বন্দুক ছুড়তে শিখিয়ে দিয়েছি—এইবার শিক্ষার পরীক্ষা হবে।

সেদিন আর কিছু না বলে বাড়ীমুখে হলুম। মনে ভয় হচ্ছিল বটে, আনন্দও হচ্ছিল খুব। নতুন নতুন দেশ দেখবার সাধ আমার চিরকাল। কেতাবে নানা দেশের ছবি দেখে আর গল্প পড়ে সেসব দেশে যাবার জন্যে আমার মন যেন উড় উড় করত। কখনো ইচ্ছে হতে সবিনসন ক্রুশোর মতন এক নির্জন দ্বীপে গিয়ে, নিজের হাতে কুঁড়েঘর বেঁধে মনের সুখে দিনের পর দিন কাটাই, কখনো ইচ্ছে হতে সিন্দবাদ নাবিকের মত 'রক' পাখির সঙ্গে আকাশে উঠি, তিমি মাছের পিঠে রান্না চড়াই, আর দ্বীপবাসী বৃদ্ধকে আছাড় মেরে জব্দ করে দিই। কখনো ইচ্ছে হতো ডুবো জাহাজে সমুদ্রের ভেতরে যাই আর পাতালরাজের ধন-ভাণ্ডার লুঠ করে নিয়ে আসি। এমনি কত ইচ্ছাই যে আমার হতো তা আর বলা যায় না,—বললে তোমরা সবাই শুনে নিশ্চয়ই খুব ঠাট্টার হাসি হাসবে।

আসল কথা কি, যকের ধন পাওয়ার সঙ্গে নতুন দেশ দেখবার আনন্দ ক্রমেই আমাকে চাঙ্গা করে তুললে। মনে যা কিছু ভয়-ভাবনা ছিল, সেই আনন্দের ঢেউ লেগে সমস্তই যেন কোথায় ভেসে গেল।

বাড়ীর কাছে আসতেই আমার আদরের কুকুর বাঘা আধহাত জিভ বার করে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমাকে আগ-বাড়িয়ে নিতে এল।

আমি বললুম, কি রে বাঘ, আমার সঙ্গে খাসিয়া পাহাড়ে বেড়াতে যাবি?

বাঘা যেন আমার কথা বুঝতে পারলে। পিছনের দু পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, সামনের দু' পায়ে সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলে, তারপর আদর

করে আমার মুখ চেটে দিতে এল। আমি তাড়াতাড়ি মুখ সরিয়ে নিয়ে তাকে নামিয়ে দিলুম।

আমার এই বাঘা বিলাতী নয়, দেশী কুকুর। কিন্তু তাকে দেখলে সে-কথা বোঝবার যো নেই। ভালোরকম যত্ন করলে দেশী কুকুরও যে কেমন চমৎকার দেখতে হয়, বাঘাই তার প্রেমাণ। তার আকার মস্ত বড়, গায়ের রং হলদে, তার উপর কালো কালো ছিট, অনেকটা চিতাবাঘের মত, তাই তার নাম রেখেছি বাঘা। ভয় কাকে বলে বাঘা তা জানে না, আর তার গায়েও বিষম জোর। একবার হাউণ্ড জাতের প্রকাণ্ড একটা বিলাতী কুকুর তাকে তেড়ে এসেছিল, কিন্তু বাঘার এক কামড় খেয়েই সে একেবারে মরোমরো হয়ে পড়েছিল। আমি ঠিক করলুম, বাঘকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

পরের দিন সকালে তখনো আমার ঘুম ভাঙেনি, হঠাৎ কে এসে ডাকাডাকি করে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলে। চেয়ে দেখি বিমল আমার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

আশ্চর্য হয়ে উঠে বসে বললুম, কিহে, সকালবেলায় হঠাৎ তুমি যে?

বিমল হাপাতে হঁপাতে বললে, সর্বনাশ হয়েছে।

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, সর্বনাশ হয়েছে। সে আবার কি?

বিমল বললে, কাল রাত্রে মড়ার মাথাটা আমার বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে গেছে !

—অ্যাঃ, বল কি?—আমি একেবারে হতভম্বের মত আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম!

পরামর্শ

আমি বললুম, মড়ার মাথা কি করে চুরি গেল, বিমল?

বিমল বললে, জানি না। সকালে উঠে দেখলুম, আমার পড়বার ঘরের দরজাটা খোলা, রাত্রে তালা-চাবি ভেঙে কেউ ঘরের ভিতর ঢুকেছে! বুকটা অমনি ধড়াস করে উঠল! মড়ার মাথাটা আমি টেবিলের টানার ভেতরে চাবি বন্ধ করে রেখেছিলুম। ছুটে গিয়ে দেখি, টানাটাও খোলা রয়েছে, আর তার ভেতরে মড়ার মাথা নেই।

আমি বলে উঠলুম, এ নিশ্চয়ই করালী মুখুয্যের কীর্তি। সেই-ই লোক পাঠিয়ে মড়ার মাথ চুরি করেছে। কিন্তু এই ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি, করালী কি করে জানলে যে মড়ার মাথাটা তোমার বাড়ীতে আছে?

বিমল বললে, করালী নিশ্চয়ই চারিদিকে চর রেখেছে! আমরা কি করছি, না করছি, সব সে জানে।

আমি বললুম, কিন্তু খালি মড়ার মাথাটা নিয়ে সে কি করবে? সঙ্কেতের মানে তো সে জানে না!

বিমল বললে, কুমার, শত্রুকে কখনো বোকা মনে কোরো না! আমরা যখন সঙ্কেত বুঝতে পেরেছি, তখন চেষ্টা করলে করালাই বা তা বুঝতে পারবে না কেন?

আমি বললুম, কিন্তু সঙ্কেতের সবটাও যে আর মড়ার মাথার ওপরে নেই। মনে নেই, আমার হাত থেকে পড়ে কাল মড়ার মাথাট। চটে গিয়েছে?

বিমল কি যেন ভাবতে ভাবতে বললে, তবু বিশ্বাস নেই!

হঠাৎ আমার আর একটা কথা মনে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছ, ঠাকুরদার পকেট-বইখানাও কি চুরি গেছে?

বিমল বললে, 'না, এইটুকুই যা আশার কথা। পকেট-বইখানা কাল রাত্রে আমি আর একবার ভালো করে পড়বার জন্যে উপরে নিয়ে গিয়েছিলুম। ঘুমোবার আগে সেখানা আমার মাথার তলায় বালিশের নীচে রেখে শুয়েছিলুম—চোর তা নিয়ে যেতে পারেনি।

আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, যাক, তবু রক্ষে ভাই! যকের ধনের ঠিকানা আছে সেই পকেট-বইয়ের মধ্যে। ঠিকানাটা না জানলে করালী সঙ্কেত জেনেও কিছু করতে পারবে না! কিন্তু খুব সাবধান বিমল! পকেট-বইখানা যেন আবার চুরি না যায়।

বিমল বললে, সে বন্দোবস্ত আজকেই করব। পকেট-বইয়ের যেখানে যেখানে পথের কথা আর ঠিকানা আছে, সেসব জায়গা আমি কালি দিয়ে এমন করে কেটে দেব যে, কেউ তা আর পড়তে পারবে না।

আমি বললুম, তাহলে আমরাও মুস্কিলে পড়ব যে !

বিমল হেসে বললে, কোন ভয় নেই! ঠিকানা আর পথের বর্ণনা আর-একখানা আলাদা কাগজে নতুন একরকম সাঙ্কেতিক কথাতে আমি টুকে রাখব,—সে সঙ্কেত আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বললুম, এখন আমরা কি করব?

বিমল বললে, আগে মড়ার মাথাটা উদ্ধার করতে হবে?

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, কি করে?

বিমল বললে, যেমন করে তারা মড়ার মাথা আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গেছে?

আমি বললুম, চোরের উপর বাটপাড়ি?

বিমল বললে, তাছাড়া আর উপায় কি? আজ রাত্রেই আমি করালীর বাড়ীতে যেমন করে পারি ঢুকব! আমার সঙ্গে থাকবে তুমি?

আমি একটু ভেবড়ে গিয়ে বললুম, কিন্তু করালী যদি জানতে পারে, আমাদের চোর বলে ধরিয়ে দেবে যে! সে-ই যে মড়ার মাথাটা চুরি করেছে, তারও তো কোন প্রমাণ নেই?

বিমল মরিয়ার মত বললে, কপালে যা আছে তা হবে। তবে এটা ঠিক, আমি বেঁচে থাকতে করালী আমাদের কারুকে ধরতে পারবে না।

মনকে তবু বুঝ মানাতে না পেরে আমি বললুম, না ভাই, দরকার নেই। শেষটা কি পাড়ায় একটা কেলেঙ্কারি হবে?

বিমল বেজায় চটে গিয়ে বললে, 'দূর ভীতু কোথাকার। এই সাহস নিয়ে তুমি যাবে রূপনাথের গুহায় যকের, ধন আনতে? তার চেয়ে মায়ের কোলের আদুরে খোকাটি হয়ে বাড়ীতে বসে থাক— তোমার পকেট-বই এখনি আমি ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছি—এই বলেই বিমল হন হন করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বিমলকে আবার ফিরিয়ে এনে বললুম, বিমল, তুমি ভুল বুঝছ—আমি একটুও ভয় পাইনি! আমি বলছিলুম কি— বিমল আমাকে বাধা দিয়ে বললে, তুমি কি বলছ, আমি তা শুনতে চাই না। স্পষ্ট করে বল, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে তুমি করালীর বাড়ীতে যেতে রাজি আছ কি না?

আমি জবাব দিলুম—'আছি।'

বিমল খুশি হয়ে আমার হাতদুটো আচ্ছা করে নেড়ে দিয়ে বললে, 'হু, এই তো 'গুড বয়ে' র মত কথা। যদি মানুষ হতে চাও, ডানপিটে হও।

আমি হেসে বললুম, কিন্তু ডানপিটের মরণ যে গাছের আগায়?

এই সাহস নিসে তুমি যাবে রূপনাথের গুহায় যকের ধন আনতে!

বিমল বললে, বিছানায় শুয়ে থাকলেও মানুষ তো যমকে কলা দেখাতে পারে না। মরতেই যখন হবে, তখন বিছানায় শুয়ে মরার চেয়ে বীরের মত মরাই ভালো। তোমরা যাদের ভালো ছেলে বলসেই গোবর-গণেশ মিনমিনে ননীর পুতুলগুলোকে আমি দু-চোখে দেখতে পারি না। সায়েবের জুতো খেয়ে তাদেরই পিলে ফাটে, বিপদে পড়লে তারাই আর বাঁচে না, মরে বটে—তাও কাপুরুষের মত। এরাই বাঙালীর কলঙ্ক জগতে যেসব জাতি আজ মাথা তুলে বড় হয়ে

আছে—বিপদের ভেতর দিয়ে, মরণের কুছ-পরোয় না রেখে তারা সবাই শ্রেষ্ঠ হতে পেরেছে। বুঝলে কুমার? বিপদ দেখলে আমার আনন্দ হয়।

চোরের উপর বাটপাড়ি

সেদিন অমাবস্যা! চারিদিকে অন্ধকার যেন জমাট বেঁধে আছে। কেবল জোনাকীগুলো মাঝে মাঝে পিটপিট করে জলছে—ঠিক যেন আঁধার-রাক্ষসের রাশি রাশি আগুন-চোখের মতন।

আমাদের বাড়ী কলকাতার প্রায় বাইরে, সেখানটা এখনে। শহরের মতন ঘিঞ্জি হয়ে পড়েনি। বাড়ীঘর খুব তফাতে তফাতে– গাছপালাই বেশী, বাসিন্দা খুব কম। অর্থাৎ আমরা নামেই কলকাতায় থাকি, এখানটাকে আসল কলকাতা বলা যায় না।

আমাদের বাড়ীর পরে একটা মাঠ, সেই মাঠের একপাশের একটা চুঝোপের ভিতরে বিমল আর আমি সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে বসে আছি। মাঠের ওপারে করালীর বাড়ী।

মশারা আমাদের সাড়া পেয়ে আজ ভারি খুশি হয়ে ক্রমাগত ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে—বিনি পয়সার ভোজের লোভে! সে-তল্লাটে যত মশা ছিল, ব্যাণ্ডের আওয়াজ শুনে সবাই সেখানে এসে হাজির হল এবং আমাদের সর্বাঙ্গে আদর করে শুড় বুলিয়ে দিতে লাগল। সেই সাংঘাতিক আদর আর হজম করতে না পেরে আমি চুপি চুপি বিমলকে বললুম, ওহে, আর যে সহ হচ্ছে না।

বিমল খালি বললে, চুপ?

—আর চুপ করে থাকা যে কত শক্ত, তা কি বুঝছ না?

—বুঝছি সব! আমি চুপ করে আছি কি করে?

এ কথার উপরে আর কথা চলে না। অগত্যা চুপ করেই রইলুম।

ক্রমে মুখ-হাত-পা যখন ফুলে প্রায় ঢোল হয়ে উঠল, তখন নিশুত রাতের বুক কাঁপিয়ে গির্জে ঘড়িতে টং করে একটা বাজল।

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এইবার সময় হয়েছে।

আমি তৈরী হয়েই ছিলুম—একলাফে ঝোপের বাইরে এসে দাঁড়ালুম!

বিমল বললে, আগে এই মুখোসটা পরে নাও! বিমল আজ দুপুরবেলায় রাধাবাজার থেকে দুটো দামী বিলাতী মুখোস কিনে এনেছে। ছুটোই কাফ্রীর মুখ,-দেখতে এমন ভয়ানক যে, রাত্রে আচমকা দেখলে বুড়ো-মিন্সেদেরও পেটের পিলে চমকে যাবে। মুখোস পরার উদ্দেশ্য, কেউ আমাদের দেখলেও চিনতে পারবে না।

মুখোস পরে দুজনে আস্তে আস্তে করালীর বাড়ীর দিকে এগুতে লাগলুম। তার বাড়ীর পিছন দিকে গিয়ে বিমল চুপিচুপি বললে, মালকোঁচ মেরে কাপড় পরে নাও।

আমি বললুম, কিন্তু এদিকে তো বাড়ীর ভেতরে ঢোকবার দরজা নেই?

বিমল বললে, দরজা দিয়ে ঢুকবে কে? আমরা কি নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি? এদিকে একটা বড় বটগাছ আছে, সেই গাছের ডাল করালীর বাড়ীর দোতলার ছাদের ওপরে গিয়ে পড়েছে। আমরা ডাল বেয়ে বাড়ীর ভেতরে যাব? বিমল তার হাতের মেরা লণ্ঠনটা উচু করে ধরলে,—একটা আলোর রেখা ঠিক আমাদের বটগাছের উপরে গিয়ে পড়ল।

বাড়ীতে ঢুকবার এই উপায়ের কথা শুনে আমার মনটা অবশ্ব খুশি হল না— কিন্তু মুখে আর কিছু না বলে, বিমলের সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর উঠতে লাগলুম।

অনেকটা উঁচুতে উঠে বিমল বললে, এইবার খুব সাবধানে এস। এই দেখ ডাল। এই ডাল বেয়ে গিয়ে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়তে হবে? .

আবছায়ার মতন ডালটা দেখতে পেলুম। বিমল আগে ডাল ধরে এগিয়ে গেল—একটা অস্পষ্ট শব্দে বুঝলুম, সে ছাদের উপরে লাফিয়ে পড়ল।

আমি দু-ধারে দু'পা রেখে আর দু'হাতে প্রাণপণে ডালটা ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগলুম—প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়, এই বুঝি পড়ে যাই। সেখান থেকে পড়ে গেলে স্বয়ং ধন্বন্তরিও আমাকে বাঁচাতে পারবেন না।

হঠাৎ বিমলের অস্পষ্ট গলা পেলুম—ব্যাস। ডাল ধরে ঝুলে পড়।

আমি ভয়ে ভয়ে ডাল ধরে ঝুলে পড়লুম।

—"ইবার ডাল ছেড়ে দাও।

ডাল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ধুপ করে ছাদের উপরে গিয়ে পড়লুম।

বিমল আমার পিঠ চাপড়ে বললে, সাবাস।

আমি কিন্তু মনের মধ্যে কিছুমাত্র ভরসা পেলুম না। এসেছি চোরের মত পরের বাড়ীতে, ধরা পড়লেই হাতে পরতে হবে হাতকড়া। তারপর আর এক ভাবনা-পালাব কোন পথ দিয়ে? লাফিয়ে তো ছাদে নামলুম, কিন্তু লাফিয়ে তো আর ঐ উঁচু ডালাঁ ফের ধরা যাবে না। বিমলকেও আমার ভাবনার কথা বললুম।

বিমল বললে, 'সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ বলেই আমাদের গাছে চড়তে হল। পালাবার সময় দরজা খুলেই পালাব।

—কিন্তু বাড়ীতে দরোয়ান আছে যে?

—তার ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এখন চল, দেখি নীচে নামবার সিঁড়ি কোন দিকে। পা টিপে টিপে এস।

ছাদের পশ্চিম কোণে সিঁড়ি পাওয়া গেল। বিমল আগে নামতে লাগল। আমি রইলুম পিছনে। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই একটা ঘর। বিমল দরজার উপরে কান পেতে চুপি চুপি আমাকে বললে, এ ঘরে কে ঘুমোচ্ছে, তার নাক ডাকছে।

চোরা-লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখে আমরা দালানের ভিতরে গিয়ে ঢুকলুম। একপাশে তিনটে ঘর—সব ঘরই ভেতর থেকে বন্ধ। বিমল চুপ করে দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। আমি তো একেবারে হতাশ হয়ে পড়লুম। এত বড় বাড়ী, ভিতরকার খবর আমরা কিছুই জানি না, এতটুকু একটা মড়ার মাথা কোথায় লুকানো আছে, কি করে আমরা সে খোঁজ পাব? বিমলও যেমন পাগল! আমাদের খালি কাদা ঘেটে মরাই সার হল!

হঠাৎ বিমল বললে, ওধারকার দালানের একটা ঘরের দরজ। দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। চল ঐদিকে।

বিমল আস্তে আস্তে সেইদিকে ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা ঠেলতেই একটু খুলে গেল। ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বিমল খানিকক্ষণ কি দেখলে, তারপর ফিরে আমার কানে কানে বললে, 'দেখ'

দরজার ফাঁক দিয়ে যা দেখলুম, তাতে আনন্দে আমার বুকটা নেচে উঠল! টেবিলের উপর মাথা রেখে করালী নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, আর তার মাথার কাছেই পড়ে রয়েছে—আমরা যা চাচ্ছি তাই—সেই মড়ার মাথাটা। করালী নিশ্চয় সঙ্কেতগুলোর অর্থ বুঝবার চেষ্টা করছিল—তারপর কখন হতাশ ও শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। করালী তাহলে সত্যিই চোর।

বিমল খুব সাবধানে দরজাটা আর একটু খুলে, পায়ের আঙলে ভর দিয়ে ঘরের ভিতরে গেল। তারপর ঘুমন্ত করালীর পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে মড়ার মাথাটা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর হাসতে হাসতে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। এত সহজে যে কেল্লা ফতে হবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

এইবার পালাতে হবে। একবার বাইরে যেতে পারলেই আমর। নিশ্চিন্ত—আর আমাদের পায় কে।

দুজনেই একতলায় গিয়ে নামলুম। উঠান পার হয়েই সদর দরজা। কিন্তু কি মুস্কিল, বিমলের চোরা-লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, একটা খুব লম্বা-চওড়া জোয়ান দরোয়ান দরজা জুড়ে চিৎপাত হয়ে শুয়ে, দিব্যি আরামে নিদ্র দিচ্ছে।

বিমল কিন্তু একটুও ইতস্ততঃ করলে না, সে খুব আস্তে আস্তে দরোয়ানকে টপকে দরজার খিল খুলতে গেল। ভয়ে আমার বুক চিপ টিপ করতে লাগল—একটু শব্দ হলেই সর্বনাশ!

কিন্তু বিমল কি বাহাদুর। সে এমন সাবধানে দরজা খুললে যে একটুও আওয়াজ হল না।

হঠাৎ আমার নাকের ভিতরে কি একটা পোকা ঢুকে গল—সঙ্গে সঙ্গে হ্যাচ্চো করে খুব জোরে আমি হেঁচে ফেললুম।

দরোয়ানের ঘুম গেল ভেঙে বাজখাই গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল —'কোন হায় রে!'—

লণ্ঠনটা তখন ছিল আমার হাতে। তার আলোতে দেখলুম, বিমল বিদ্যুতের মতন ফিরে দাঁড়াল, তারপর বাঘের মতন দরোয়ানের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তুই হাতে তার গল টিপে ধরল। খানিকক্ষণ গোঁ-গোঁ করেই চোখ কপালে তুলে দরোয়ানজী একেবারে অজ্ঞান।

তারপর আর কি—দে ছুট তো দে ছুট! ঘোড়দৌড়ের ঘোড়াও তখন ছুটে আমাদের ধরতে পারত না—একদমে বাড়ীতে এসে তবে ইপি ছেড়ে বাঁচলুম।

জানলায় কালো মুখ

এক এক গেলাস জল খেয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে, দুজনে বাইরের ঘরে গিয়ে বসলুম। রাত তখন আড়াইটে।

বিমল বললে, আজ রাতে আর ঘুম নয়। কাল বৈকালের গাড়ীতে আমরা আসাম যাব।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, সে কি! এত তাড়াতাড়ি।

বিমল বললে, হুঁ তাড়াতাড়ি না করলে চলবে না। করালী রাস্কেল আমাদের ওপরে চটে রইল—মড়ার মাথা যে আমরাই আবার তার হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি, এতক্ষণে নিশ্চয়ই সে তা টের পেয়েছে! কখন কি ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসবে কে তা জানে? কালই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়তে হবে।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, মা গেছেন শান্তিপুরে, মামার বাড়ীতে। তাকে না জানিয়ে আমি কি করে যাব?

বিমল বললে, তাঁকে চিঠি লিখে দাও—আমার সঙ্গে তুমি আসামে বেড়াতে যাচ্ছ, বড় তাড়াতাড়ি বলে যাবার আগে দেখা করতে পারলে না।

আমি চিন্তিত মুখে বললুম, চিঠি যেন লিখে দিলুম, কিন্তু এত বড় একটা কাজে যাচ্ছি, অনেক বন্দোবস্ত করতে হবে যে! কালকের মধ্যে সব গুছিয়ে উঠতে পারব কেন?

বিমল বিরক্ত স্বরে বললে, তোমাকে বিশেষ কিছুই করতে হবে না, বন্দোবস্ত যা করবার তা আমিই করব অখন। তুমি খালি কাপড়চোপড় আর গোটাকতক কোট-প্যান্ট নিও-বুঝলে অকর্মর ধাড়ী?

—কেন? কোট-প্যাণ্ট আবার কি হবে?

—যেতে হবে পাহাড়ে আর জঙ্গলে। সেখানে ফুলবাবুর মত কাছা-কোঁচা সামলাতে গেলে চলবে না—তাহলে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে।

আমি চুপ ক'রে ভাবতে লাগলুম। বিমল বললে, ভেবেছিলুম দুজনেই যাব। কিন্তু তুমি যেরকম নাবালক গোবেচারা দেখছি, সঙ্গে আর একজনকে নিলে ভালো হয়।

—কাকে নেবে?

—আমার চাকর রামহরিকে। সে আমাদের পুরানো লোক; বিশ্বাসী, বুদ্ধিমান আর তার গায়েও খুব জোর। আমার জন্যে সে হাসতে হাসতে প্রাণ দিতে পারে?

—আচ্ছ, সে কথা মন্দ নয়। আমিও বাঘাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তাতে তোমার আপত্তি—

—চুপ? বলেই বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর ছুটে গিয়ে হঠাৎ ঘরের একটা জানলা দু-হাট করে খুলে দিলে। স্পষ্ট দেখলুম জানলার বাহির থেকে একখানা বিশ্রী কালো-কুচকুচে মুখ বিদ্যুতের মতন একপাশে সরে গেল। জানলায় কান পেতে নিশ্চয় কেউ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল! বিমলও দাঁড়াল না— ঘরের কোণ থেকে একগাছা মাথা-সমান উঁচু মোট বাশের লাঠি নিয়ে একছুটে বেরিয়ে গেল! আমি ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম।

খানিক পরে বিমল ফিরে এসে আমাকে ডাকলে। আমি আবার দরজা খুলে দিয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলুম, ব্যাপার কি? লোকটাকে ধরতে পারলে?

লাঠিগাছা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে বিমল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, না, পিছনে তাড়া করে অনেকদূর গিয়েছিলুম, কিন্তু ধরতে পারলুম না?

—লোকটা কে বল দেখি?

—কে আবার—করালীর লোক, খুব সম্ভব ভাড়াটে গুণ্ডা। কুমার, ব্যাপার কিরকম গুরুতর তা বুঝছ কি? লোকটা আমাদের কথা হয়তো সব শুনেছে?

—বিমল, তুমি ঠিক বলেছ, আমাদের আর দেরি করা উচিত নয়, আমরা কালকেই বেরিয়ে পড়ব।

—তা তো পড়ব, কিন্তু বিপদ হয়তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।

—তার মানে?

—করালী বোধ হয় তার দলবল নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবে।

আমি একেবারে দমে গেলুম! বিমল বসে বসে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, যা-থাকে কপালে। তা বলে করালীর ভয়ে আমরা যে কেঁচোর মতন হাত গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে থা কব, এ কিছুতেই হতে পারে না। কালকেই আমাদের যাওয়া ঠিক।

আমি কাতরভাবে বললুম, বিমল, গোঁয়ার্তুমি কোরো না?

বিমল চৌকির উপরে একটা ঘুষি মেরে বললে, আমি যাবই যাব। তোমার ভয় হয়, বাড়ীতে বসে থাকো। আমি নিজে যকের ধন এনে তোমার বাড়ীতে পৌছে দিয়ে যাব—দেখি, করালী হারে কি আমি হারি?

আমি তার হাত ধরে বললুম, বিমল, আমি ভয় পাইনি। তুমি যাও তো আমিও নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু ভেবে দেখ, শেষটা বন-জঙ্গলের ভেতরে একটা খুনোখুনি হতে পারে। করালীরা দলে ভারি, আমরা তার কিছুই করতে পারব না।'

বিমল অবহেলার হাসি হেসে বললে, করালীর নিকুচি করেছে। কুমার, আমার গায়েই খালি জোর নেই—বুদ্ধির জোরও আমার কিছু কিছু আছে। তুমি কিছু ভেব না, আমার সঙ্গে চল, করালীকে কিরকম নাকানি-চোবানি খাওয়াই একবার দেখে নিও।

আমি বিমলকে ভালোরকম চিনি। সে মিছে জাঁক কাকে বলে জানে না। সে যখন আমাকে অভয় দিচ্ছে, তখন মনে মনে নিশ্চয় কোন একটা নূতন উপায় ঠিক করেছে। কাজেই আমিও নিশ্চিন্তভাবে বললুম, আচ্ছ ভাই, তুমি যা বল আমি তাতেই রাজি!

শাপে বর

সারারাত জিনিস-পত্তর গুছিয়ে, ভোরের মুখে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে যথাসময়ে আমরা বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আমাদের দলে রইল বিমলের পুরানো চাকর রামহরি ও আমার কুকুর বাঘ। দুটো বড় বড় ব্যাগ, একটা 'সুটকেস ও একটা 'ইকমিক কুকার' ছাড়া বিমল আর কিছু সঙ্গে নিতে দিলে না।

ব্যাগ দুটোর ভিতরে কিন্তু ছিল না, এমন জিনিস নেই। ছুরিছোরা, কাঁচি, নানারকম ওষুধভরা ছোট একটি স্বাক্স, ফটো তুলবার ক্যামেরা, ইলেকটিক 'টর্চ বা মশাল, 'ফ্লাস্ক', (যার সাহায্যে দুধ, জল বা চা ভরে রাখলে চব্বিশ ঘণ্টা সমান ঠাণ্ড বা গরম থাকে), গোটকতক বিস্কুট, ফল ও মাছ-মাংসের টিন (অনেক দিনে যা নষ্ট হবে না), আসাম সম্বন্ধে খানকয়েক ইংরেজী বই, ছাতা, ছোট ছোট দুটো বালিস আর সতরঞ্চি, কাফ্রির সেই দুটো মুখোস (বিমলের মতে পরে ও-দুটোও কাজে লাগতে পারে) প্রভৃতি কত রকমের জিনিসই যে এই ব্যাগ দুটোর ভিতরে ভরা হয়েছে, তা আর নাম করা যায় না। 'সুটকেসের ভিতরে আমাদের জাম-কাপড় রইল। আমরা প্রত্যেকেই এক এক গাছা মোটা দেখে লাঠি নিলুম— দরকার হলে এ লাঠি দিয়ে মানুষের মাথা খুব সহজেই ভাঙা যেতে পারবে। অবশ্য, বিমল বন্দুক দুটোও সঙ্গে নিতে ভুললে না।

বাড়ী ছেড়ে বেরুবার সময় মনটা যেন কেমন-কেমন করতে লাগল। দেশ ছেড়ে কোথায় কোন বিদেশে, পাহাড়ে-জঙ্গলে বাঘ-ভালুক আর শত্রুর মুখে পড়তে চললুম, যাবার সময়ে মায়ের পায়ে প্রণাম পর্যন্ত করতে যেতে পারলুম না-কে জানে এ জীবনে আর কখনো ফিরে এসে মাকে দেখতে পাব কিনা! একবার

মনে হল বিমলকে বলি যে, আমি যাব না? কিন্তু পাছে সে আমাকে ভীরু ভেবে বসে, সেই ভয়ে মনকে শক্ত করে রইলুম।

বিমলও আমার মুখের পানে তাকিয়ে মনের কথা বোধহয় বুঝতে পারলে। কারণ, হঠাৎ সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, কুমার, তোমার মন কেমন করছে?

আমি সত্য কথাই বললুম—তো একটু একটু করছে বৈকি?

—'মায়ের জন্যে?

—ভেব না। খুব সম্ভব আজকেই হয়তো তোমার মাকে তুমি দেখতে পাবে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, কি করে? আমরা তে যাচ্ছি আসামে?

—তা যাচ্ছি বটে!—বলেই বিমল একবার সন্দেহের সঙ্গে পিছন দিকে চেয়ে দেখলে—তার চোখ-মুখের ভাব উদ্বিগ্ন। সে নিশ্চয় দেখছিল শত্রুরা আমাদের পিছু নিয়েছে কিনা ! কিন্তু কারুকেই দেখতে পাওয়া গেল না।

বিমলের বাড়ীর গাড়ী আমাদের স্টেশনে নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমরা গাড়ীতে গিয়ে চড়ে বসলুম। গাড়ী ছেড়ে দিলে। বিমল সারা পথ অন্যমনস্ক হয়ে রইল। মাঝে মাঝে তেমনি উদ্বেগের সঙ্গে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে পেছনপানে চেয়ে দেখতে লাগল।

শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে আমরা গাড়ী থেকে নামলুম। একবার চারিদিকে সতর্ক চোখে চেয়ে দেখে আমি বললুম, বিমল, আপাতত আমাদের কোন ভয় নেই। করালীরা আমাদের পিছু নিতে পারেনি।

বিমল সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললে, তোমরা এইখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি টিকিট কিনে আনি।

টিকিট কিনে ফিরে এসে, বিমল আমাদের নিয়ে স্টেশনের ভিতর গিয়ে ঢুকল। বাঘাকে জন্তুদের কামরায় তুলে দিয়ে এল। বাঘা বেচারী এত লোকজন

দেখে ভড়কে গিয়েছিল। সে কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তে রাজি হল না, শেষট বিমল শিকল ধরে তাকে জোর করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল।

গাড়ী ছাড়তে এখনো দেরি আছে। কামরার মধ্যে বেজায় গরম দেখে, আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়ে প্লাটফর্মের উপর পায়চারি করতে লাগলুম। ঘুরতে ঘুরতে গাড়ীর একেবারে শেষ দিকে গেলুম। হঠাৎ একটা কামরার ভিতর আমার নজর পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে আমার সারা দেহে কাটা দিয়ে উঠল। আমি সভসে দেখলুম, কামরার ভিতরে করালী বসে আছে। দুজন মিশকালে গুণ্ডার মত লোকের সঙ্গে হাতমুখ নেড়ে সে কি কথাবার্তা কইছিল—আমাকে দেখতে পেলে না। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে নিজেদের গাড়ীতে এসে উঠে পড়লুম।

বিমল বললে, 'কিহে কুমার, ব্যাপার কি? চোখ পালে তুলে ছুটতে ছুটতে আসছ কেন?

আমি বললুম, বিমল, সর্বনাশ হয়েছে !

বিমল হেসে বললে, কিছুই সর্বনাশ হয়নি! তুমি করালীকে দেখেছ তো? তা আর হয়েছে কি? সে যে আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না, আমি তা অনেকক্ষণই জানি। যাক, তুমি ভয় পেও না, চুপ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো?

বিমল যত সহজে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, আমি ত। পারলুম না। আস্তে আস্তে এককোণে গিয়ে বসে পড়লুম বটে, মন কিন্তু বিমর্ষ হয়ে রইল। বিমল আমার ভাব দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। এদিকে গাড়ী ছেড়ে দিলে।

জানি না, কপালে কি আছে। জঙ্গলের ভিতরে অপঘাতেই মরতে হবে দেখছি! করালীর সঙ্গে কত লোক আছে তা কে জানে? সে যখন আমাদের পিছু নিয়েছে, তখন সহজে কি আর ছেড়ে দেবে? আমি খালি এইসব কথা ভেবে ও নানারকমের বিপদ কল্পনা করে শিউরে উঠতে লাগলুম।

বিমল কিন্তু দিব্য আরামে সামনের বেঞ্চে পা তুলে দিয়ে বসে নিজের মনে কি একখানা বই পড়তে লাগল।

গাড়ী একটা স্টেশনে এসে থামল। বিমল মুখ বাড়িয়ে স্টেশনের নাম দেখে আমাকে বললে, 'কুমার, প্রস্তুত হও। পরের স্টেশন রাণাঘাট। এইখানেই আমরা নামব।

এ আবার কি কথা! আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, রাণাঘাটে নামব! কেন?

—সেখান থেকে শান্তিপুরে, তোমার মামার বাড়ীতে মায়ের কাছে যাব।

—হঠাৎ তোমার মত বদলালে কেন?

—মত কিছুই বদলায়নি,—আজ কি করব, কাল থেকেই আমি তা জানি। কিন্তু তোমাকে কিছু বলিনি। এই দেখ, আমি শান্তিপুরের টিকিট কিনেছি। এর কারণ কিছু বুঝলে কি?

—না।

—আমি বেশ জানতুম, করালী আমাদের পিছু নেবে। কালকেই তার চর শুনে গেছে, আমরা আসামে যাব। আজও সে জানে, আমরা আসাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না। সে তাই ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ীর ভিতরে বসে থাকুক, আর সেই ফাকে আমরা রাণাঘাটে নেমে পড়ি। দিন-দুয়েক তোমার মামার বাড়ীতে বসে বসে আমরা তো মজা করে পোলাও কালিয়া খেয়ে নি। আর ওদিকে করালী যখন জানতে পারবে আমরা আর গাড়ীর ভিতরে নেই, তখন মাথায় হাত দিয়ে একেবারে বসে পড়বে। নিশ্চয় ভাববে যে আমরা তাকে ভুলিয়ে অন্য কোন পথ দিয়ে যকের ধনের খোঁজে গেছি। সে হতাশ হয়ে কলকাতার দিকে ফিরবে, আর আমরা তোমার মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে সোজা আসামের দিকে যাত্রা করব। আর কেউ আমাদের পিছু নিতে পারবে না।

আমার পক্ষে এটা হল শাপে বর। ওদিকে করালীও জব্দ, আর এদিকে আমারও মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল,—একেই বলে লাঠি না ভেঙে সাপ মারা! বিমলের দু'খানা হাত চেপে ধরে আমি বলে উঠলুম, ভাই, তুমি এত বুদ্ধিমান ! আমি যে অবাক হয়ে যাচ্ছি?

গাড়ী রাণাঘাটে এসে থামতেই আমরা টপাটপ, নেমে পড়লুম— কেউ আমাদের দেখতে পেলে ন!

নতুন বিপদের ভয়

তিনদিন মামার বাড়ীতে খুব আদরে কাটিয়ে মায়ের কাছ থেকে মামি বিদায় নিলুম। মা কি সহজে আমাকে ছেড়ে দিতে চান? তবু তাকে আমরা যকের ধন আর বিপদ-আপদের কথা কিছুই বলনি, তিনি শুধু জানতেন আমরা আসামে বেড়াতে যাচ্ছি।

যাবার সময়ে বিমলকে ডেকে মা বললেন, দেখো পাবা, আমার শিবরাত্রির সলতেটুকুকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম, ওকে সাবধানে রেখ?

বিমল বললে, ভয় কি মা, কুমার তো আর কচি খোকাটি নেই, ওর জন্যে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

মা বললেন, না বাছা, কুমারকে তুমি কোথাও একলা ছেড়ে দিও না-ও ভারি গোঁয়ার-গোবিন্দ, কি করতে কি করে বসবে কিছুই ঠিক নেই। ও যদি তোমার মত শান্তশিষ্টটি হত তাহলে আমাকে এত ভেবে মরতে হত না?

বিমল একটু মুচকে হেসে বললে, আচ্ছা মা, আমি তো সঙ্গে রইলুম, যাতে গোঁয়ার্তুমি করতে না পারে, সেদিকে আমি চোখ রাখব।

আমি মনে মনে হাসতে লাগলুম। মা ভাবছেন আমি গোঁয়ারগোবিন্দ আর বিমল শান্তশিষ্ট। কিন্তু বিমল যে আমার চেয়ে কত বড় গোঁয়ার আর ডানপিটে, মা যদি তা ঘুণাক্ষরেও জানতেন!

মায়ের পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আমি, বিমল আর রামহরি দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লুম—বাঘা আমাদের পিছনে পিছনে আসতে লাগল। কিন্তু শান্তিপুরের স্টেশনের ভিতরে এসে, রেলগাড়ীকে দেখেই বাঘা পেটের তলায় ল্যাজ গুজে একেবারে যেন মুসড়ে পড়ল। সে বুঝলে, আবার তাকে জন্তুদের গাড়ীর ভিতরে নিয়ে গিয়ে একলাটি বেঁধে রেখে আসা হবে।

রাণাঘাটে নেমে আমরা আসল গাড়ী ধরলুম। বিমল খুশিমুখে বললে, যাক্ এবারে আর করালীর ভয় নেই। সে হয়তো এখন আসামে বসে নিজের হাত কামড়াচ্ছে, আর আমাদের মুণ্ডুপাত করছে?

আমি বললুম, আসাম থেকে করালী এখন কলকাতায় ফিরে থাকতেও পারে।

বিমল বললে, কলকাতায় কেন, সে এখন যমালয়ে গেলেও আমার আপত্তি নেই। চল, গাড়ীতে উঠে বসা যাক?

অনেক রাত্রে গাড়ী সারাঘাটে গিয়ে দাঁড়াল। যে-সময়ের কথা বলা হচ্চে, পদ্মার উপর তখনে সারার বিখ্যাত পুলটি তৈরি হয়নি। সারাঘাটে সকলকে তখন গাড়া থেকে নেমে স্টীমারে করে পদ্মার ওপারে গিয়ে আবার রেলগাড়ী চড়তে হত। কাজেই সারায় এসে আমাদেরও মাল-পত্তর নিয়ে গাড়ী থেকে নামতে হল।

আগেই বলেছি, আমি কখনো কলকাতার বাইরে পা বাড়াইনি। স্টীমারে চড়ে চারিদিকের দৃশ্য দেখে আমার যেন তাক লেগে গেল! কলকাতার গঙ্গার চেয়েও চওড়া নদী যে আবার আছে, এই পদ্মাকে দেখে প্রথম সেটা বুঝতে পারলুম। আকাশে চাঁদ উঠেছে আর গায়ে জ্যোৎস্না মেখে পদ্মা নেচে, ফুলে, বেগে ছুটে চলছে— রূপোর জল দিয়ে তার ঢেউগুলি তৈরী। মাঝে মাঝে সাদা ধবধবে বালির চর চোখের সামনে কখনো জেগে উঠছে, কখনো মিলিয়ে যাচ্ছে—স্বপ্নের ছবির মতন। আমার মনে হল ঐ নিরিবিলি বালির চরগুলির মধ্যে হয়তো এতক্ষণ পরীরা এসে হাসি-খুসি, খেলাধূলা করছিল। স্টীমারের গর্জন শুনে দৈত্য বা দানব আসছে ভেবে এখন তারা ভয় পেয়ে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিশিয়ে গেছে !

বালির চর এড়িয়ে স্টীমার ক্রমেই অন্য তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, খালাসীরা জল মাপছে আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি বলছে। স্টীমারের একদিকে নানা জাতের মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে জড়ামড়ি করে বসে, শুয়ে, দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে, আর একদিকে ডেকের উপরে উজ্জল আলোতে চেয়ার-টেবিল পেতে

বাহার দিয়ে বসে সাহেব-মেমরা খানা খাচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে অন্যদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি, একটা লোক আড়-চোখে আমার পানে তাকিয়ে আছে। তার সঙ্গে আমার চোখাচোখি হতেই সে হন হন করে এগিয়ে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল!

স্টীমার ঘাটে এসে লাগল। আমরা সবাই একে একে নীচে নেমে স্টেশনের দিকে চললুম। আসাম মেল তখন আমাদের অপেক্ষায় দাড়িয়ে ভোঁস ভোঁস করে ধোঁয়া ছাড়ছিল—আমরাও তার পেটের ভিতর ঢুকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলুম। কামরার জানলার কাছে আমি বসেছিলুম। প্লাটফর্মের ওপাশে আর একখানা রেলগাড়ী—সেখানাতে দার্জিলিঙের যাত্রীদের ভিড়। ফাষ্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসের সায়েব-মেমের কামরার ভিতরে বিছানা পাতছিল—একঘুমে রাত কাটিয়ে দেবার জন্যে। তাদের ঘুমের আয়োজন দেখতে দেখতে আমারও চোখ ঢুলে এল। আমিও শুয়ে পড়বার চেষ্টা করছি—হঠাৎ আবার দেখলুম, স্টীমারের সেই অচেন লোকটা প্লাটফর্মের উপরে দাঁড়িয়ে তেমনি আড়-চোখে আমাদের দিকে বারে বারে চেয়ে দেখছে।

এবার আমার ভারি সন্দেহ হল। বিমলের দিকে ফিরে বললুম, 'ওহে, দেখ দেখ?

বিমল বেঞ্চির উপর কম্বল পাততে পাততে বললে, আর দেখাশুনে কিছু নয়—এখন চোখ বুজে নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার সময়?

—ওহে, না দেখলে চলবে না। স্টীমার থেকে একটা লোক বরাবর আমাদের ওপর নজর রেখেছে—এখনো সে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাহারা দিচ্ছে!

শুনেই বিমল একলাফে জানলার কাছে এসে বললে, কৈ কোথায়?

—ঐ যে।

কিন্তু লোকটাও তখন বুঝতে পেরেছিল যে, আমরা তার উপরে সন্দেহ করেছি। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল।

বিমল চিন্তিতের মত বললে, তাই তো, এ আবার কে?

—করালীর চর নয় তো?

— করালী? কিন্তু সে কি করে জানবে আজ আমরা এখানে আছি?

—হয়তো করালী আমাদের চালাকি ধরে ফেলেছে! সে জানত আমরা চার দিন পরেই আবার আসামে যাব। আসামে যেতে গেলে এ পথে আসতেই হবে। তাই সে হয়তো এইখানে এতদিন ঘাঁটি আগলে বসেছিল।

— অসম্ভব নয়। আচ্ছা, একবার নেমে দেখা যাক, করালী এই গাড়ীর কোন কামরায় লুকিয়ে আছে কিনা?—এই বলেই বিমল প্লাটফর্মের উপর নেমে এগিয়ে গেল।

গাড়ী যখন ছাড়ে-ছাড়ে, বিমল তখন ফিরে এল।

আমি বললুম, কি দেখলে?

—কিছু না। প্রত্যেক কামরায় তন্নভন্ন করে খুঁজেছি—করালী কোথাও নেই। বোধ হয় আমরা মিছে সন্দেহ করেছি?

বিমলের কথায় আবার আমি অনেকট নিশ্চিন্ত হলুম-যদিও মনের মধ্যে কেমন একটা খটকা লেগে রইল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

বিমল বললে, ওহে কুমার, এই বেলা যতটা পারে ঘুমিয়ে নাও – আসামে একবার গিয়ে পড়লে হয়তো আমাদের আহার-নিদ্রা একরকম ত্যাগ করতেই হবে।

বিমল বেঞ্চির উপরে 'আঃ' বলে সটান লম্ব হল, আমিও শুয়ে পড়লুম। সুখের বিষয়, এ কামরায় আর কেউ ছিল না, সুতরাং ঘুমে আর ব্যাঘাত পড়বার ভয় নেই ।

এ চোর কে?

আমরা খাসিয়া পাহাড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি—সামনে বুদ্ধদেবেৰ এক পাথরের মূর্তি। গভীর রাত্রি, আকাশে চাঁদ নেই, সবদিকে অন্ধকার । মাথার অনেক উপরে তারাগুলো টিপ টপ করে জ্বলছে, তাদের আলোতে আশেপাশে ঝাপসা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো পাহাড়ের মাথা—আমার মনে হল সেগুলো যেন বড় বড় দানবের কালে কালে মায়ামূর্তি। তারা যেন প্রেতপুরীর পাহারাওয়ালার মত ওৎ পেতে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। এখনি হুড়মুড় করে আমাদের ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে! চারিদিক এত স্তব্ধ যে গায়ে কাঁটা দেয়, বুক ছাৎ ছাৎ করে! শুধু রাত করছে—ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ আর ভয়ে কেঁপে গাছপালা করছে—সর সর সর সর।

বিমল চুপিচুপি আমাকে বললে, এই বুদ্ধদেবের মূর্তি! এইখানেই যকের ধন আছে?

হঠাৎ কে খল খল করে হেসে উঠল—সে বিকট হাসির প্রতিধ্বনি যেন পাহাড়ের মাথাগুলো টপকে লাফাতে লাফাতে কোথায় কতদূরে কোন চির-অন্ধকারের দেশের দিকে চলে গেল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, রামহরি আঁতকে উঠে দু-হাতে মুখ ঢেকে ধুপ করে বসে পড়ল, বাঘা আকাশের দিকে মুখ তুলে ল্যাজ গুটিয়ে কেঁউ কেঁউ করে কাঁদতে লাগল।

বিমল সাহসে ভর করে বললে, কে হাসলে?

আবার সেই খল খল করে বিকট হাসি! কে যে হাসছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবে সে হাসি নিশ্চয়ই মানুষের নয়। মানুষ কখনো এমন ভয়ানক হাসি হাসতে পারে না!

বিমল আবার বললে, কে তুমি হাসছ?

—আমি? উঃ, সে স্বর কি গম্ভীর!

—কে তুমি? সাহস থাকে আমার সামনে এস?

—আমি তোমার সামনেই আছি।

—মিথ্যে কথা! আমার সামনে খালি বুদ্ধদেবের মূর্তি আছে?

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! আমাকে বুদ্ধদেবের মূর্তি ভাবচ? চেয়ে দেখ ছোকরা, আমি যক!

বুদ্ধদেবের সেই মূর্তিটা একটু একটু নড়তে লাগল, তার চোখ ছটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল।

বিমল বন্দুক তুললে। মূর্তিটা আবার খল খল করে হেসে বললে, তোমার বন্দুকের গুলিতে আমার কিছুই হবে না।

বিমল বললে, কিছু হয় কিনা দেখাচ্ছি? সে বন্দুকের ঘোড়া টিপতে উদ্যত হল।

আকাশ-কাঁপানো স্বরে মূর্তি চেঁচিয়ে বললে, 'খবর্দার! তোমার গুলি লাগলে আমার গায়ের পাথর চটে যাবে! বন্দুক ছুড়লে তোমারি বিপদ হবে।'.

—'হোকগে বিপদ-বিপদকে আমি ডরাই না!

—জানো আমি আজ হাজার হাজার বছর ধরে এইখানে বসে আছি, আর তুমি কালকের ছোকরা হয়ে আমার শান্তিভঙ্গ করতে এসেছ? কি চাও তুমি?

—গুপ্তধন।

—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ! গুপ্তধন চাও,—ভারি আম্বা যে! এই গুপ্তধন নিতে এসে এখানে তোমার মত কত মানুষ মারা পড়েছে ত। জানো? ঐ দেখ তাদের শুকনো হাড়?

মূর্তির চোখের আলোতে দেখলুম, একদিকে মস্তবড় হাড়ের ঢিপি — হাজার হাজার মানুষের হাড়ে সেই ঢিপি অনেকখানি উঁচু হয়ে উঠেছে!

বিমল একটুও না দমে বললে, ও দেখে আমি ভয় পাই না— আমি গুপ্তধন চাই।

—আমি গুপ্তধন দেব না?

—দিতেই হবে।

—না, না, না?

—তাহলে বন্দুকের গুলিতে তোমার আগুন-চোখ কানা করে দেব!

গর্জন করে মূর্তি বললে, তার আগেই তোমাকে আমি বধ করব।

—তুমি তো পাথর, এক পা এগুতে পার না, আমি তোমার নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি, তুমি কি করবে?

— হাঃ হাঃ হাঃ, চেয়ে দেখ এখানে চারিদিকেই আমার প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে! আমার হুকুমে এখনি ওরা তোমাদের টিপে মেরে ফেলবে?

—কোথায় তোমার প্রহরী?

—প্রত্যেক পাহাড় আমার প্রহরী!

—ওরাও তো পাথর, তোমার মত নড়তে পারে না। ওসব বাজে কথা রেখে হয় আমাকে গুপ্তধন দাও —নয় এই তোমাকে গুলি করলুম!—বিমল আবার বন্দুক তুললে।

—তবে মর। প্রহরী! মূর্তির আগুন-চোখ নিবে গেল— সঙ্গে সঙ্গে পলক না যেতেই অন্ধকারের ভিতর অনেকগুলো পাহাড়ের মত মস্তবড় কি কতকগুলো লাফিয়ে উঠে আমাদের উপরে হুড়মুড় করে এসে পড়ল। বিষম এক ধাক্কায় মাটির উপর পড়ে অসহ্য যাতনায় চেঁচিয়ে আমি বললুম–বিমল –বিমল—

আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলুম, রেলগাড়ীর বেঞ্চের উপর থেকে গড়িয়ে আমি নীচে পড়ে গেছি, আর বিমল আমার মুখের উপরে বুকে বলছে, ভয় কি কুমার, সে রাস্কেল পালিয়েছে?

তখনো স্বপ্নের ঘোর আমার যায়নি,—আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, যক আর নেই?

বিমল আশ্চর্যভাবে বললে, যকের কথা কি বলছ কুমার?

আমি উঠে বসে চোখ-কচলে অপ্রস্তুত হয়ে বললুম, বিমল, আমি এতক্ষণ একটা বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছিলুম। শুনলে তুমি অবাক হবে?

বিমল বললে, আর গাড়ীর ভিতরে এখনি যে কাণ্ডটা হয়ে গেল, তা মোটেই স্বপ্ন নয়! শুনলে তুমিও অবাক হবে।

আমি হতভম্বর মত বললুম, গাড়ীর ভেতরে আবার কি কাণ্ড হল?

বিমল বললে, একটা চোর এসেছিল।

—চোর? বল কি?

—হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, একটা লোক আমাদের ব্যাগ হাতড়াচ্ছে! আমি তখনি উঠে তার রগে এক ঘুসি বসিয়ে দিলুম, সে ঠিকরে তোমার গায়ের উপরে গিয়ে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে তুমিও আঁতকে উঠে বেঞ্চির তলায় হলে চিৎপাত! লোকটা পড়েই আবার দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর চোখের নিমেষে জানলা দিয়ে বাইরে একলাফ মেরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

—চলন্ত ট্রেন থেকে সে লাফ মারলে? তাহলে নিশ্চয়ই মারা পড়েছে!'

—বোধ হয় না। ট্রেন তখন একটা স্টেশনের কাছে আস্তে আস্তে চলছিল।

—আমাদের কিছু চুরি গিয়েছে নাকি?

—হুঁ। মড়ার মাথাটা। বলেই বিমল হাসতে লাগল।

—বিমল, মড়ার মাথাটা আবার চুরি গেল, আর তোমাব মুখে তবু হাসি আসছে?

—হাসব না কেন, চোর যে জাল মড়ার মাথা নিয়ে পালিয়েছে!

—"জাল মড়ার মাথা! সে আবার কি?

—তোমাকে তবে বলি শোনো। এ-রকম বিপদ যে পথে ঘটতে পারে, আমি তা আগেই জানতুম। তাই কলকাতা থেকে আসবার আগেই আমাদের পাড়ার এক ডাক্তারের কাছ থেকে আর একটা নতুন মড়ার মাথা জোগাড় করেছিলুম। নতুন মাথাটার উপরেও আসল মাথায় যেমন অঙ্ক আছে, তেমনি অঙ্ক ক্ষুদে দিয়েছি,— তবে এর মানে হচ্ছে একেবারে উল্টো ! এই নকল মাথাটাই

ব্যাগের ভেতরে ছিল। আমি জানতুম মড়ার মাথা চুরি করতে আবার যদি চোর আসে, তবে নকলটাকে নিয়েই সে তুষ্ট হয়ে যাবে। হয়েছেও তাই?

—'বিমল, ধণ্যি তোমার বুদ্ধি! তুমি যে এত ভেবে কাজ কর, আমি তা জানতুম না। আসল মড়ার মাথা কোথায় রেখেছ?

অনেকের বাড়ীতে যেমন চোর-কুঠুরি থাকে, আমার ব্যাগের ভেতরেও তেমনি একটা লুকানো ঘর আছে। এ ব্যাগ আমি অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছি । মড়ার মাথা তার ভেতরেই রেখেছি।

—কিন্তু আমাদের পিছনে এ কোন নতুন শত্রু লাগল বল দেখি?

—শত্রু আর কেউ নয়—এ করালীর কাজ! সে আমার চালাকিতে ভোলেনি, নিশ্চয় এই গাড়ীতেই কোথাও ঘুপটি মেরে লুকিয়ে আছে।

—তবেই তো!

—'কুমার, আবার তোমার ভয় হচ্ছে নাকি?

—ভয় হচ্ছে না, কিন্তু ভাবনা হচ্ছে বটে! এই দেখ না, করালীর চর যদি আজই ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের বুকে ছুরি বসিয়ে দিয়ে যেত?

—করালী আমাদের সঙ্গে নেই, এই ভেবে আমরা অসাবধান হয়েছিলুম বলেই আজ এমন কাণ্ড ঘটল। এখন থেকে আবার সাবধান হব—রামহরি আর বাঘাকে সর্বদাই কাছে কাছে রাখব, আর সকলে মিলে একসঙ্গে ঘুমবও না।

—'করালী যখনি জানবে সে জাল মড়ার মাথা পেয়েছে, তখনি আবার আমাদের আক্রমণ করবে।

—আমরাও প্রস্তুত। কিন্তু সে যদি সাঙ্কেতিক লেখা এখনো পড়তে না পেরে থাকে, তবে এ জাল ধরা তার কর্ম নয়?

গাড়ী তখন উধ্বশ্বাসে ছুটছে আর আমাদের চোখের সুমুখ দিয়ে চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল বন-জঙ্গল-মাঠের দৃশ্যের পর দৃশ্য ভেসে যাচ্ছে —ঠিক যেন বায়োস্কোপের ছবির পর ছবি! আমার আর ঘুমোবার ভরসা হল না—বাইরের

দিকে চেয়ে, বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলুম। প্রতি মিনিটেই গাড়ী আমাদের দেশ থেকে দূরে —আরও দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলছে, কত অজানা বিপদ আমাদের মাথার উপরে অদৃশ্যভাবে ঝুলছে ! জানি না, এই পথ দিয়ে এ জীবনে কখনো দেশে ফিরতে পারব কি না!

ছাতকে

আজ আমরা শ্রীহট্টে এসে পৌছেছি।

বিমল বললে, কুমার, এই সেই শ্রীহট্ট।

আমি বললুম, হ্যাঁ, এই হচ্ছে সেই কমলালেবুর বিখ্যাত জন্মভূমি?

বিমল বললে, উঁহু, কমলালেবু ঠিক শ্রীহট্ট শহরে তো জন্মায় না, তবে এখানকার প্রধান নদী সুরমা দিয়েই নৌকায় চড়ে কমলালেবু কলকাতায় যাত্রা করে বটে। খালি কমলালেবু নয়, এখানকার কমলামধুও যেমন উপকারী, তেমনি উপাদেয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ও অঞ্চলে আরো কি পাওয়া যায়?

—'পাওয়া যায় অনেক জিনিস, যেমন আলু, কুমড়ো, শশা, আনারস, তুলো, আখ, তেজপাতা, লঙ্কা, মরিচ, ডালচিনি আর চূণ প্রভৃতি। এসব মাল এ অঞ্চল থেকেই রপ্তানি হয়। কিন্তু এখানকার পান-সুপারির কথা শুনলে তুমি অবাক হবে!

—অবাক হব? কেন?

—বাংলা দেশের মত এখানে পানের চাষ হয় না, কিন্তু এদেশে পানের সঙ্গে সুপারির বড় ভাব। বনের ভেতরে প্রায়ই দেখবে, সুপারি-কুঞ্জেই পান জন্মেছে, সুপারি গাছের দেহ জড়িয়ে পানের লতা উপরে উঠেছে। তাছাড়া, এখানকার "সফলাং" আর একটি বিখ্যাত জিনিস।

—সফলাং ! সে আবার কি?

—কেশুরের মত একরকম মূল। খাসিয়ারা খেতে বড় ভালবাসে।

সারাদিন আমরা শ্রীহট্টেই রইলুম। এখান থেকে আমাদের গন্তব্যস্থান খাসিয়া পাহাড়কে দেখতে পেলুম। মনে হল, এর বিশাল বুকের ভিতরে না জানি

কত রহস্যই লুকানো আছে, সে রহস্যের মধ্যে ডুব দিলে আর থই পাব কিনা, তাই বা কে বলতে পারে? এ তো আর কলকাতার রাস্তার কোন নম্বর-জানা বাড়ীর খোঁজে যাচ্ছি না, এই অশেষ পাহাড়-বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় আছে যকের ধন, কি করে আমরা তা টের পাব? এখন পর্যন্ত করালী বা তার কোন চরের টিকিট পর্যন্ত দেখতে না পেয়ে আমরা তবু অনেকটা আশ্বস্ত হলুম। বুঝলুম, জাল মড়ার মাথা পেয়ে করালী এতটা খুসি হয়েছে যে, আমাদের উপরে আর পাহারা দেওয়া দরকার মনে করছে না ! বাঁচা গেছে। এখন করালীর এই ভ্রমটা কিছুদিন স্থায়ী হলেই মঙ্গল। কারণ তার মধ্যেই আমরা কেল্লা ফতে করে নিশ্চয় দেশে ফিরে যেতে পারব।

মাঝ-রাত্রে স্টীমারে চড়ে, সুরমা নদী দিয়ে পরদিন সকালে ছাতকে গিয়ে পৌছলুম।

সুরমা হচ্ছে শ্রীহট্টের প্রধান নদী। ছাতকও এই নদীর তীরে অবস্থিত। কলকাতায় ছাতকের চূণের নাম আমরা আগেই শুনেছিলুম। তবে এ চুণের উৎপত্তি ছাতকে নয়, চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে খাসিয়া পাহাড়ে এই চূণ জন্মে, সেখান থেকে রেলে করে ও নৌক। বোঝাই হয়ে ছাতকে আসে এবং ছাতক থেকে আরো নানা জায়গায় রপ্তানি হয়। চেরাপুঞ্জিতে খালি চূণ নয়, আগে সেখানে লোহার খনি থেকে অনেক লোহা পাওয়া যেত, সেই সব লোহায় প্রায় আড়াইশো বছর আগে বড় বড় কামান তৈরি হত। কিন্তু বিলাতী লোহার উপদ্রবে খাসিয়া পাহাড়ের লোহার কথা এখন আর কেউ ভুলেও ভাবে না। চূণ ও লোহা ছাড়া কয়লার জন্যেও খাসিয়া পাহাড় নামজাদা। কিন্তু পাঠাবার ভালো বন্দোবস্ত না থাকার দরুণ, এখানকার কয়লা দেশ-দেশান্তরে যায় না।

ছাতক জায়গাটি মন্দ নয়। এখানে থানা, ডাক্তারখানা, পোস্টআপিস, বাজার ও মাইনর ইস্কুল—কিছুরই অভাব নেই। একটি ডাক-বাংলোও আছে, আমরা সেইখানে গিয়েই আশ্রয় নিলুম। বিমলের মুখে শুনলুম, এখানে পিয়াইন

নামে একটি নদী আছে, সেই নদী দিয়েই আমাদের নৌকায় চড়ে ভোলাগঞ্জ পর্যন্ত যেতে হবে—এ সময়ে নদীর জল কম বলে নৌকো তার বেশী আর চলবে না। কাজেই ভোলাগঞ্জ থেকে মাইল-দেড়েক হেঁটে আমরা থারিয়াঘাটে যাব, তারপর পাথর-বাধানে রাস্তা ধরে খাসিয়া পাহাড়ে উঠব। আজ ডাক-বাংলোয় বিশ্রাম করে কাল থেকে আমাদের যাত্রা আরম্ভ।

ছাতক থেকে খাসিয়া পাহাড়ের দৃশ্য কি চমৎকার! নীলরঙের প্রকাণ্ড মেঘের মত, দৃষ্টি-সীমা জুড়ে আকাশের খানিকট ঢেকে খাসিয়া পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, যতদূর নজর চলে—পাহাড়ের যেন আর শেষ নেই! পাহাড়ের কথা আমি কেতাবে পড়ে হলুম, কিন্তু চোখে কখনো দেখিনি, পাহাড় যে এত সুন্দর তা আমি জানতুম না; আমার মনে হতে লাগল, খাসিয়া পাহাড় যেন আমাকে ইসারা করে কাছে ডাকছে—ইচ্ছে হল তখনি এক ছুটে তার কোলে গিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যার সময় খানিক গল্পগুজব করে আমরা শুয়ে পড়লুম। বেশ একটু শীতের আমেজ দিয়েছিল, লেপের ভিতরে ঢুকে কি আরামই পেলুম!

বিমলও তার লেপের ভিতরে ঢুকে বললে, ঘুমিয়ে নাও ভাই, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে নাও। কাল এমন সময়ে আমরা খাসিয়া পাহাড়ে, এত আরামের ঘুম আর হয়তে হবে না?

আমি বললুম, কিন্তু আমরা তো ঘুমবো, পাহার দেবে কে?

বিমল বললে, সে ব্যবস্থা আমি করেছি। দরজার বাইরে বারান্দায় রামহরি আর বাঘা শুয়ে আছে। তার ওপরে দরজাজানলাগুলোও ভেতর থেকে আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

আমার উদ্বেগ দূর হল। যদিও শত্রুর দেখা নেই, তবু সাবধানে থাকাই ভালো!

বিনি-মেঘে বাজ

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম তা জানি না, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল!..উঠতে গিয়ে উঠতে পারলুম না, আমার বুকের উপরে কে যেন চেপে বসে আছে। ভয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, বিমল, বিমল!

অন্ধকারের ভিতরে কে আমার গলা চেপে ধরে হুমকি দিয়ে বললে, 'খবর্দার, চ্যাঁচালেই টিপে মেরে ফেলব?

আমি একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, অনেক কষ্টে বললুম, গলা ছাড়ো, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!

আমার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সে বললে, আচ্ছা, ফের চ্যাঁচালেই কিন্তু মরবে!

সেই ঘুট-ঘুটে অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, আমার বুকের উপরে কে এ, ভূত না মানুষ?...ঘরের অন্য কোণেও একটা ঝটাপটি শব্দ শুনলুম।.তারপরেই একটা গ্যাঙানি আওয়াজ—কে যেন কি দিয়ে কাকে মারলে—তারপর আবার সব চুপচাপ।

অন্ধকারেই হেঁড়ে-গলায় কে বললে, শম্ভু, ব্যাপার কি?

আর একজন বললে, বাবু, এ ছোড়ার গায়ে দস্তির জোর, আর একটু হলেই আমাকে বুক থেকে ফেলে দিয়েছিল। আমি লাঠি দিয়ে একে ঠাণ্ডা করেছি?

—একেবারে শেষ হয়ে গেল নাকি?

—না, অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধ হয়।

—আচ্ছা, তাহলে আমি আলো জ্বালি

—বলেই সে ফস করে একটা দেশলাই জ্বেলে বাতি ধরালে। দেখলুম, এ সেই লোকটা— ইষ্টিমারে আর ইষ্টিশানে যে গোয়েন্দার মত পিছু নিয়ে আমার পানে তাকিয়েছিল।

আমাকে তার পানে চেয়ে থাকতে দেখে সে হেসে বললে, "কিহে স্যাঙাত, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছ যে ! আমাকে চিনতে পেরেচ নাকি?

আমি কোন জবাব দিলুম না। আমার বুকের উপরে তখনো একটা লোক চেপে বসেছিল। ঘরের আর এককোণে বিমলের দেহ স্থির হয়ে পড়ে আছে, দেহে প্রাণের কোন লক্ষণ নেই। দরজাজানলার দিকে তাকিয়ে দেখলুম—সব বন্ধ। তবে এরা ঘরের ভিতরে এল কেমন করে?

বাতি-হাতে লোকটা আমার কাছে এগিয়ে এসে বললে, ছোকরা, ভারি চালাক হয়েছ—না? যকের ধন আনতে যাবে? এখন কি হয় বল দেখি?

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, কে তোমরা?

—অত পরিচয়ে তোমার দরকার কিহে বাপু?

—তোমরা কি চাও?

—পকেট-বই চাই—পকেট-বই! তোমার ঠাকুরদাদার পকেটবইখানা। আমাদের দরকার। মড়ার মাথা আমরা পেয়েছি, এখন পকেট-বইখানা কোথায় রেখেছ বল।

এত বিপদেও মনে মনে আমি না হেসে থাকতে পারলুম না। এরা ভেবেছে সেই জাল মড়ার মাথা নিয়ে সকের ধন আনতে যাবে। পকেট-বইয়ের কথাও এরা জানে। নিশ্চয় এরা করালীর লোক।

লোকটা হঠাৎ আমাকে ধমক দিয়ে বললে, এই ছোকরা! চুপ করে আছ যে? শীগগির বল পকেট-বই কোথায়—নইলে, আমার হাতে কি, দেখছ? সে কোমর থেকে ফস করে একখান। ছোরা বার করলে, বাতির আলোয় ছোরাখানা বিদ্যুতের মত জল, জল, করে উঠল।

আমি ভাড়াতাড়ি বললুম, ঐ ব্যাগের ভেতরে পকেট-বই আছে।

লোকটা বললে, 'হু, পথে এস বাবা, পথে এস। শম্ভু ব্যাগটা খুলে দ্যাখ তো।

শম্ভু বিমলের দেহের পাশে বসেছিল, লোকটার কথায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ঘরের অন্য কোণে গিয়ে আমাদের বড় ব্যাগট। নেড়ে-চেড়ে বললে, ব্যাগের চাবি বন্ধ।

বাতি-হাতে লোকটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাগের চাবি কোথায়?

আমি কিছু বলবার আগেই বিমল হঠাৎ একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, এই যে, চাবি আমার কাছে।—বলেই সে হাত তুললে—তার হাতে বন্দুক।

লোকগুলো যেন হতভম্ব হয়ে গেল। আমিও অবাক ।

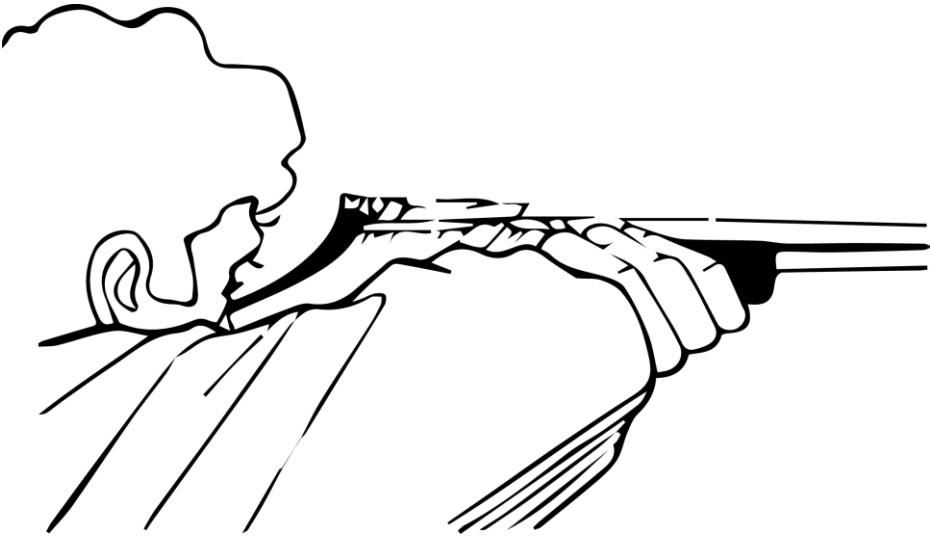

বিমল বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে বললে, যে এক-পা নড়বে, তাকেই আমি গুলি করে কুকুরের মত মেরে ফেলব।

যার হাতে বাতি ছিল, সে হঠাৎ বাতিটা মাটির উপর ফেলে দিলে — সমস্ত ঘর আবার অন্ধকার। সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ঝলক তুলে দুম করে বিমলের বন্দুকের আওয়াজ হল, একজন লোক 'বাবা রে, গেছি রে' বলে চীৎকার করে উঠল, আমার বুকের উপরে যে চেপে বসেছিল, সেও আমাকে ছেড়ে দিলে,— তারপরেই ঘরের দরজা খোলার শব্দ, বাঘার ঘেউ ঘেউ, রামহরির গলা। কি যে হল কিছুই বুঝতে পারলুম না, বিছানার ওপর উঠে আচ্ছন্যের মতন আমি বসে পড়লুম।.

বিমল বললে, 'কুমার, আলো জ্বালো—শীগগির। আমি আমতা আমত করে বললুম, কিন্তু-কিন্তু— —'ভয় নেই, আলো জ্বালো, তারা পালিয়েছে।' কিন্তু আমাকে আর আলো জ্বালতে হল না—রামহরি একটা লণ্ঠন হাতে করে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে এসে ঢুকল।

ঘরের ভিতরে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। বিমল মেঝের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে বললে, এই যে রক্তের দাগ।

গুলি খেয়েও লোকটা পালাল! বোধ হয় ঠিক জায়গায় লাগেনি— হাত-টাত জখম হয়েছে।

রামহরি উদ্বিগ্ন মুখে বললে, ব্যাপার কি বাবু?

বিমল সে কথায় কান না দিয়ে বললে, কিন্তু জানলা-দরজা সব বন্ধ— অথচ ঘরের ভেতরে শত্রু, ভারি আশ্চর্য তো! তারপরে একটু থেমে, আবার বললে, ও, বুঝেছি। নিশ্চয় আমরা যখন ও-ঘরে খেতে গিয়েছিলুম, রাস্কেলরা তখনি ফাঁক পেয়ে এ-ঘরে ঢুকে খাটের তলায় ঘুপটি মেরে লুকিয়েছিল?

কথাটা আমারও মনে লাগল। আমি বললুম, ঠিক বলেছ! কিন্তু বিমল, তুমি তো অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে, হঠাৎ কি করে দাঁড়িয়ে উঠলে?

বিমল বললে, আমি মোটেই অজ্ঞান হইনি, অজ্ঞান হওয়ার ভান করে চুপচাপ পড়েছিলুম! ভাগ্যি বন্দুকটা আমার বিছানাতেই ছিল। এমন সময়ে বাঘা

ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘরের ভিতরে এসে, আদর করে আমার পা চেটে দিতে লাগল। আমি দেখলুম বাঘার মুখে যেন কিসের দাগ! এ যে রক্তের মত। তবে কি বাঘা জখম হয়েছে? তাড়াতাড়ি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে বললুম, 'না অন্য কারুর রক্ত। বাঘা নিশ্চয় সেই লোকগুলোর কারুকে না কারুকে তার দাঁতের জোর বুঝিয়ে দিয়ে এসেছে।

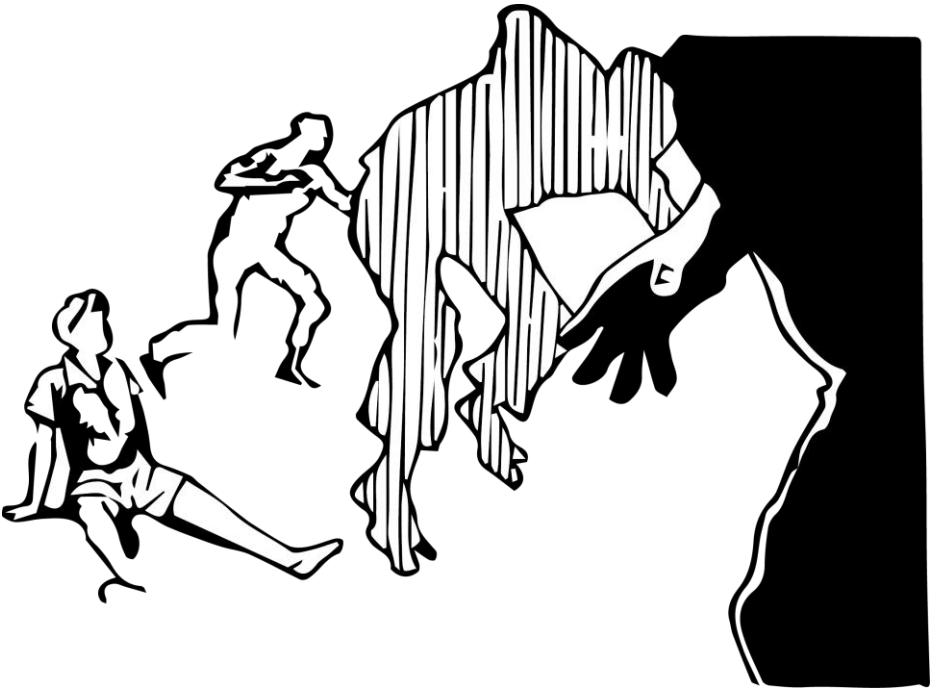

তারিফ করে তার মাথা চাপড়ে আমি বললুম, সাবাস বাঘ, সাবাস — বাঘা আদরে যেন গলে গিয়ে আমার পায়ের তলায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

বিমল বললে, এবার থেকে বাঘাকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুমবে। বাঘ আমাদের কাছে ঘরের ভেতরে থাকলে এ বিপদ হয়তে। ঘটত না।

আমি বললুম, ত তো ঘটত না, কিন্তু এখন ভবিষ্যতের উপায় কি? করালী নিশ্চয়ই আমাদের ছাড়ান দেবে না, এবার তার চরের হয়তো দলে আরও ভারি হয়ে আসবে।

বিমল সহজভাবেই বললে, তা আসবে বৈকি।

আমি বললুম, আর এটাও মনে রেখো, কাল থেকে আমরা লোকালয় ছেড়ে পাহাড়ের ভেতরে গিয়ে পড়ব। সেখানে আমাদের রক্ষা করবে কে?

বিমল বন্দুকটা ঠক করে মেঝের উপরে ঠুকে, একখানা হাত তুলে তেজের সঙ্গে বললে, আমাদের এই হাতই আমাদের রক্ষা করবে। যে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তাকে বাঁচাবার সাধ্য কারুর নেই।

—কিন্তু—

—আজ থেকে "কিন্তু" র কথা ভুলে যাও কুমার, ও হচ্ছে ভীরু, কাপুরুষের কথ। বলেই বিমল এগিয়ে গিয়ে ঘরের একটা জানলা খুলে দিয়ে আবার বললে, চেয়ে দেখ কুমার!

জানলার বাইরে আমার চোখ গেল। নিঝুম রাতের চাঁদের আলো মেখে স্বর্গের মত খাসিয়া পাহাড়ের স্থির ছবি আঁকা রয়েছে! চমৎকার, চমৎকার। শিখরের পর শিখরের উপর দিয়ে জ্যোৎস্নার ঝরনা রূপোলী লহর তুলে বয়ে যাচ্ছে, কোথাও আলো, কোথাও ছায়া—ঠিক যেন পাশাপাশি হাসি আর অশ্রু। বিভোর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম—এমন দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি!

বিমল বললে, কি দেখছ?

আমি বললুম, স্বপ্ন।

বিমল বললে না, স্বপ্ন নয়—এ সত্য। তুমি কি বলতে চাও কুমার, এই স্বর্গের দরজায় এসে আবার আমরা খালিহাতে ফিরে যাব?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, না বিমল, না,—ফিরব না, আমরা ফিরব না। আমার সমস্ত প্রাণ-মন ঐখানে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে চাইছে। যকের ধন পাই আর না পাই—আমি শুধু একবার ঐখানে যেতে চাই।

বিমল জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে বললে, কাল আমরা ওখানে যাব। আজ আর কোনো কথা নয়, এস আবার নাক ডাকানে যাক—বলেই বন্দুকটা পাশে

নিয়ে বিছানার উপরে লম্ব হয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক পরেই তার নাকের গর্জন শুরু হল । তার নিশ্চিন্ত ঘুম দেখে কে বলবে যে, একটু আগেই সে সাক্ষাৎ যমের মুখে গিয়ে পড়েছিল। বিমলের আশ্চর্য সাহস দেখে আমিও সমস্ত বিপদের কথা মন থেকে তাড়িয়ে দিলুম। তারপর খাসিয়া পাহাড় আর যকের ধনের কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লুম, তা আমি জানি না।

খাসিয়া পাহাড়ে

চেরাপুঞ্জি পার হয়ে এগিয়ে এসেছি অনেকদূর। চেরাপুঞ্জি থেকে শিলং শহর প্রায় ষোলো ক্রোশ তফাতে। এই পথটা মোটর-গাড়ী করে যাওয়া যায়। আমরা কিন্তু ওমুখে আর হলুম না। কারণ জানা-পথ ধরলে শত্রুপক্ষের সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবন বেশ।

পাহাড়ের পর পাহাড়-ছোট, বড়, মাঝারি। যেদিকে চাই কেবলি পাহাড়—কোন কোন পাহাড়ের শৃঙ্গের আকার বড় অদ্ভুত, দেখতে যেন হাতীর গুড়ের মত, উপরে উঠে তারা যেন নীলাকাশকে জড়িয়ে ধরে পায়ের তলায় আছড়ে ফেলতে চাইছে। পাহাড়গুলিকে দূর থেকে ভারি কঠোর দেখাচ্ছিল, কিন্তু কাছে এসে দেখছি সবুজ ঘাসের নরম মখমলে এদের গা কে যেন মুড়ে দিয়েছে। কত লতাকুঞ্জে কত যে ফুল ফুটে রয়েছে—হাজার হাজার চুণী-পান্না হীরাজহরতের মত তাদের 'আহা-মরি' রঙের বাহার—এ যে ফুলপরীদের নির্জন খেলাঘর। কোথাও ছোট ছোট ঝরনা ঝির ঝির ঝরে পড়ছে, তারপর পাথরের পর পাথরের উপরে লাফিয়ে পড়ে ঘুমপাড়ানি গান গাইতে গাইতে চোখের আড়ালে তলিয়ে গিয়েছে। কোথাও পথের দু'পাশে গভীর খাদ, তার মধ্যে শত শত ডালচিনির গাছ আর লতাপাতার জঙ্গল শীতের ঠাণ্ডা বাতাসে থেকে থেকে কেঁপে উঠছে,—সেসব খাদের পাশ দিয়ে চলতে গেলে প্রতিপদেই ভয় হয়—এই বুঝি টলে পা ফসকে অতল পাতালের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে যাই। সবচেয়ে বিশেষ করে চোখে পড়ে সরল গাছের সার। এত সরল গাছ আমি আর কখনো দেখিনি—সমস্ত পাহাড়ই যেন তারা একেবারে দখল করে নিতে চায়। সেসব গাছে বেশী ডালপালাপাতার জাল নেই; মাটি থেকে তার ঠিক সোজ হয়ে উপরে উঠে যেন সদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

নির্জন পাহাড়, মাঝে মাঝে কখনো কেবল দু একজন কাঠুরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। কাঠুরেরা জাতে খাসিয়া, তাদের চেহারার সঙ্গে গুখাদের চেহারার অনেকট মিল আছে —নাক থ্যাবড়া, গালের হাড় উঁচু, চোখ বাঁকা বাঁকা, মাথা ছোট ছোট।

এখানে এসে এক বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হয়েছি। এতদিনেও করালীর দলের আর কোন সাড়া-শব্দ পাইনি। আমরা যে পথ ছেড়ে এমন অপথ বা বিপথ ধরব, নিশ্চয় তারা সেট। কল্পনা করতে পারেনি। হয়তো তারা এখম আমাদের ধরবার জন্তে শিলং শহরে গিয়ে খুজে খুজে হয়রান হয়ে মরছে। কেমন জব্দ!

বিমল আজ দুটো বুনো মোরগ শিকার করেছে। সেই মোরগের মাংস কত মিষ্টি লাগবে তাই ভাবতে ভাবতে খুসি হয়ে পথ চলছি।

পশ্চিম আকাশে সিঁদুর ছড়িয়ে অস্ত গেল সূর্য। আমি বললুম, বিমল, সারাদিন পথ চলে পা টাটিয়ে উঠেছে, ক্ষিদে ও পেয়েছে খুব। আজকের মত বিশ্রাম করা যাক।

বিমল বললে, 'কেন কুমার, চারিদিকের দৃশ্য কি তোমার ভালো লাগছে না?

—ভালো লাগছে না আবার। এত ভালো লাগছে যে, দেখে দেখে সাধ আর মিটছে না। কিন্তু এই ক্ষিদের মুখে রামপাখির গরম মাংস এরও চেয়ে ঢের ভালো লাগবে বলে মনে হচ্ছে?

এই বলাবলি করতে করতে আমরা একটা ছোট ঝরনার কাছে এসে পড়লুম। ঝরনার ঠিক পাশেই পাহাড়ের বুকে একটা গুহার মত বড় গর্ত।

বিমল বললে, বাঃ, বেশ আশ্রয় মিলেছে। এই গুহার ভিতরেই আজকের রাতটা দিব্যি আরামে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। রামহরি, মোটমাট এইখানেই রাখে।'

আমাদের প্রত্যেকের পিঠেই কম-বেশী মোট ছিল, সবাই সেগুলো একে একে গুহার ভিতরে নামিয়ে রাখলুম। গুহাটি বেশ বড়-সড়, আমাদের সঙ্গে আরো চার-পাচজন লোক এলেও তার মধ্যে থাকবার অসুবিধা হত না।

গুহার ভিতরটা ঝেড়ে-ঝুড়ে পরিষ্কার করে রামহরি বললে, খোকাবাবু, এইবার রান্নার উদ্যোগ করি?

বিমল বললে, হ্যাঁ—দাড়াও, আমি তোমাদের একটা মজা দ্যাখাচ্ছি, এখানে আগুনের জন্যে কিছু ভাবতে হবে না। এই বলে একটা কুড়ল নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি আর রামহরি ছুরি নিয়ে তখনি মোরগ দুটোকে রান্নার উপযোগী করে তুলতে বসে গেলুম। বাঘাও সামনের দুই পায়ে ভর দিয়ে বসে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে লোলুপ চোখে,ঘাড় বেঁকিয়ে একমনে আমাদের কাজ দেখতে লাগল, তার হাব-ভাবে বেশ বোঝা গেল ; রামপাখির মাংসের প্রতি তারও লোভ আমাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

খানিক পরেই বিমল একরাশ কাঠ ঘাড়ে করে ফিরে এল। আমি বললুম, এলে তো খালি কতকগুলো কাঠ নিয়ে। এর মধ্যে মজাটা তার কি আছে?

—এই দ্যাখনা, বলেই বিমল কিছু শুকনো পাতা জড়ো করে দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন জ্বাললে, তারপর একখান কাঠ নিয়ে তার উপরে ধরতেই দপ করে তা জ্বলে উঠল। বিমল কাঠখানা উঁচু করে মাথার উপরে ধরলে, আর সেটা ঠিক মশালের মতই দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগল।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, বাহ্ বেশ মজার ব্যাপার তো অত সহজে জ্বলে, ওটা কি কাঠ?

বিমল বললে, ‘সরল কাঠ। এ কাঠে একরকম তেলের মত রস আছে, তাই এমন সুন্দর জ্বলে। এর আর এক নাম-ধূপকাষ্ঠ।

রামহরি সেদিন সরল কাঠেই উকুন ধরিয়ে রামপাখির মাংস চড়িয়ে দিলে। আমরা দুজনে গুহার ধারে বসে গল্প করতে লাগলুম।তখন সন্ধ্য উৎরে গেছে, একটা পাহাড়ের আড়াল থেকে চাঁদ মামার আধখানা হাসিমুখ উঁকি

মারছে—সেই আবছায়া-মাখ জ্যোৎস্নার আলোতে সামনের পাহাড়, বন আর ঝরনাকে কেমন যেন অদ্ভূত দেখাতে লাগল।

বিমল হঠাৎ বললে, কুমার, তুমি ভূত বিশ্বাস কর?

আমি বললুম, কেন বল দেখি?

বিমল বললে, আমরা যাদের দেশে আছি, এই খাসিয়ারা অনেকেই ভূতকে দেবতার মতো পুজো করে। ভূতকে খুসি রাখবার জন্যে খাসিয়ার মোরগ আর মুগীর ডিম বলি দেয়। যে মুলুকে ভূতের এত ভক্ত থাকে, সেখানে ভূতের সংখ্যাও নিশ্চয় খুব বেশী,— কি বল?

আমি বললুম, না, আমি ভূত মানি না ।

বিমল বললে, কেন?

—কারণ আমি কখনো ভূত দেখিনি। তুমি দেখেছ?

—না, তবে আমি একটি ভূতের গল্প জানি।

— সত্যি গল্প?

—সত্যি-মিথ্যে জানি না, তবে যার মুখে গল্পটি শুনেছি, সে বলে এর আগাগোড়া সত্যি।

—কে সে?

—আমাদের বাড়ীর পাশে একজন লোক বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকত, এখন সে উঠে গেছে। তার নাম ঈশান।

—বেশ তো, এখনো রান্না শেষ হতে দেরি আছে, ততক্ষণে তুমি গল্পট শেষ করে ফেল-বিশ্বাস না হোক, সময়টা কেটে যাবে।

একটা বেজায় ঠাণ্ডা বাতাসের দমকা এল। দু'জনেই ভালো করে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বসলুম। বিমল এমনভাবে গল্প শুরু করলে, ঈশানই যেন তা নিজের মুখে বলছে।

মানুষ, না পিশাচ?

[ঈশানের গল্প]

আমাদের বাড়ী যে গ্রামে, তার ক্রোশ-দুয়েক তফাতেই গঙ্গা। কাজেই গায়ে কোন লোক মারা গেলে, গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়েই মড়া পোড়ানো হত।

সেবারে ভোলার ঠাকুরমা যখন মারা পড়ল—তখন আমরা পাড়ার জন-পাঁচেক লোক মিলে মড়া নিয়ে শ্মশানে চললুম। শ্মশানে পৌছোতে বেজে গেল রাত বারোটা।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশান যে কেমন ঠাঁই, শহরের বাসিন্দারা তা বুঝতে পারবে না। এখানে গ্যাসের আলোও নেই, লোকজন গোলমালও নেই। অনেক গাঁয়েই শ্মশানে কোন ঘরও থাকে না। খোলা, নির্জন জায়গা, চারিদিকে বন-জঙ্গল, প্রতিপদেই হয়তো মড়ার মাথা আর হাড় মাড়িয়ে চলতে হয়। রাতে সেখানে গেলে খুব সাহসীরও বুক রীতিমত দমে যায়।

আমাদের গাঁয়ের শ্মশান-ঘাটে একখান হেলে পড়া দরজাভাঙা কোঠাঘর ছিল। তার মধ্যেই গিয়ে আমরা মড়া নামিয়ে রাখলুম।

পাড়াগাঁয়ের শ্মশানে চিতার জ্বালানি কাঠ তো কিনতে পাওয়া যায় না, কাজেই আশপাশের বন-জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনতে হয়।

ভোলা বললে, আমি মড়া আগলে থাকি, তোমরা সকলে কাঠ আনো গে যাও।

আমি ৰললুম, একলা থাকতে পারবে তো? ভোলা যেমন ডানপিটে, তার গায়ে জোরও ছিল তেমনি বেশী। সে অবহেলার হাসি হেসে বললে, ভয় আবার কি? যাও, যাও — দেরি কোরো না।

আমরা পাঁচজনে জঙ্গলে ঢুকে কাঠ কাটতে লাগলুম। একটা চিতা জ্বালাবার মত কাঠ সে তো বড় অল্প কথা নয়। কাঠ কাটতেই কেটে গেল প্রায় আড়াই ঘণ্টা; বুঝলুম, আজ ঘুমের দফায় ইতি,— মড়া পোড়াতেই ডেকে উঠবে ভোরের পাখি।

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শ্মশানের দিকে যাচ্ছি, এমন সময়ে আমাদের একজন বলে উঠল, ওহে দ্যাখো, দ্যাখো, শ্মশানের ঘরের মধ্যে কি রকম আগুন জ্বলছে!

তাই তো, ঘরের ভিতরে সত্যিই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে যে! অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে চললুম। ঘরের কাছ বরাবর আসতেই লণ্ঠনের আলোতে দেখলুম, মাটির উপরে কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। লোকটাকে উলটে ধরে লণ্ঠনট তার মুখের কাছে নামিয়ে দেখলুম, সে আর কেউ নয়— আমাদেরই ভোলা ! তার মুখ দিয়ে গ্যাজল উঠছে, সে একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

ভোলা এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, আর ওখানে ঘরের ভিতরে আগুন জ্বলছে—এ কেমন ব্যাপার। সকলে হতভম্ব হয়ে ঘরের দিকটায় ছুটে গেলুম। কাছে গিয়ে দেখি, ঘরের দরজার কাছটায় কে তাল তাল মাটি এনে ঢিপির মত উঁচু করে তুলেছে, আরো খানিকট উঁচু হলেই দরজার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। এসব কি কাণ্ড কিছুই বুঝতে না পেরে আমরা ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখলুম, এককোণে একরাশ কাঠ দাউ-দাউ করে জ্বলছে, একটা কাঁচা মাংস-পোড়ার বিশ্রী গন্ধ উঠছে, আর কোথাও মড়ার কোন চিহ্নই নেই!

ভয়, বিস্ময় আর দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আমরা আবার ভোলার কাছে ফিরে এলুম। তার মুখে ও মাথায় অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেবার পর আস্তে আস্তে সে চোখ চাইলে। তারপর উঠে বসে যা বললে, তা হচ্ছে এই –

‘তোমরা তো কাঠ কাটতে চলে গেলে, আমি মড়া আগলে বসে রইলুম। খানিকক্ষণ এমনি চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার কেমন তন্দ্র এল। চোখ বুজে ঢুলচি, হঠাৎ থপ করে কি একটা শব্দ হল । চমকে জেগে উঠে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, কিন্তু কেউ কোথাও নেই। আমারই মনের ভ্রম ভেবে খাটের পায়াতে মাথা রেখে আবার আমি ঘুমোবার চেষ্টা করলুম।.খানিকক্ষণ পরে আবার সেই থপ করে শব্দ। এবার আমার সন্দেহ হল হয়তো মড়ার লোভে বাইরে শেয়াল-টেয়াল কিছু এসেছে। এই ভেবে আর চোখ খুললুম না—এমনিভাবে আরো খানিকটা সময় কেটে গেল। ওদিকে সেই ব্যাপারটা সমানই চলেছে—মাঝে মাঝে সব স্তব্ধ, আর মাঝে মাঝে থপ করে শব্দ। শেষটা জ্বালাতন হয়ে আমি আবার চোখ চাইতে বাধ্য হলুম। কিন্তু একি! ঘরের দরজার সামনেটা যে মাটিতে প্রায় ভরতি হয়ে উঠছে,—আর একটু পরেই আমার বাইরে যাবার পথ ও যে একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে! কে এ কাজ করলে, এ তো যেসে কথা নয়! আমার ঘুমের ঘোর চট করে কেটে গেল, সেই কাচা মাটির পাঁচিল টপ কে তখনই আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম।

চাঁদের আলোয় চারিদিক ধবধব করছে। ঘর আর গঙ্গার মাঝখানে চড়া। এদিক-ওদিক চাইতেই দেখলুম, খানিক তফাতে একটা ঝাকড়া-চুলে লোক হেঁট হয়ে একমনে দুই হাতে ভিজে মাটি খুড়ছে। বুঝলুম, তারই এই কাজ। কিন্তু এতে তার লাভ কি? লোকটা পাগল নয় তো?

ভাবছি, এদিকে সে আবার একতাল মাটি নিয়ে ঘরের দিকে অগ্রসর হল। মস্ত লম্বা চেহারা, মস্ত লম্ব চুল আর দাড়ি, একরকম উলঙ্গ বললেই হয়—পরনে খালি একটুকরো কপনি। সে মাথা নীচু করে আসছিল, তাই আমাকে দেখতে পেলে না। কিন্তু সে কাছে আসবামাত্র আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে তখন মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে,—উঃ, কি ভয়ানক তার চোখ, ঠিক যেন দু'খানা বড় বড় কয়লা দপ দপ করে জ্বলছে ! এমন জ্বলন্ত চোখ আমি জীবনে কখনো দেখিনি।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, কে তুমি?

উত্তরে মাথার কাঁকড় চুলগুলো ঝাঁকুনি দিয়ে নেড়ে সে এমন এক ভূতুড়ে চীৎকার করে উঠল যে, আমার বুকের রক্ত যেন বরফ হয়ে গেল। মহা-আতঙ্কে প্রাণপণে আমি দৌড় দিলুম, কিন্তু বেশীদূর যেতে না-যেতেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলুম । তারপর আর কিছু আমার মনে নেই?

ভোলার কথা শুনে বুঝলুম, সে লোকটা পিশাচ ছাড়া আর কিছু নয়। দুষ্ট প্রেতাত্মারা সুবিধা পেলেই মানুষের মৃতদেহের ভিতরে ঢুকে তাকে জ্যান্ত করে তোলে। মরা মানুষ এইভাবে জ্যান্ত হলেই তাকে পিশাচ বলে। এই রকম কোন পিশাচই ভোলার ঠাকুমার দেহকে আগুন জেলে আধপোড়া করে খেয়ে গেছে; ভোলাকেও নিশ্চয় সে ফলার করবার ফিকিরে ছিল, কেবল আমর: ঠিক সময়ে এসে পড়তেই এ যাত্র। ভোলা বেঁচে গেল কোনগতিকে। সেবারে আমাদের আর মড়া পোড়াতে হল না।

দুটো জ্বলন্ত চোখ

বিমলের গল্প শুনে আমার আঁৎটা কেমন ছাং-ছাৎ করতে লাগল, গুহার বাইরে আর চাইতেই ভরসা হল না—কে জানে, সেখানে ঝোপঝাপের মধ্যে কোন বিদ্‌কুটে চেহারা ওৎ পেতে বসে আছে হয়তো!

আমার মুখের ভাব দেখে বিমল হেসে বললে, ও কি হে কুমার, তোমার ভয় করছে নাকি?

—তা একটু একটু করছে বৈকি?

—এই না বললে, তুমি ভূত মানে না?

—হুঁ, আগে মানতুম না, কিন্তু এখন আর মানি না বলে মনে হচ্ছে না?

—ভয় কি কুমার, আমার বিশ্বাস এ গল্পটার একবর্ণও সত্যি নয়, আগগোড়া গাঁজাখুরি। ভূতের গল্পমাত্রই রূপকথা, পাছে লোকে বিশ্বাস না করে, তাই তাকে সত্যি বলে আসর জমানো হয়।

কিন্তু তবু আমার মন মানল না, বিমলকে কিছুতেই আমার কাছছাড়া হতে দিলুম না। ভয়ের চোটে রামহরির রান্না রামপাখির মিষ্টি মাংস পর্যন্ত তেমন তারিয়ে খেতে পারলুম না।

গুহার বাইরের দিকে বিমল অনেকগুলো সরল কাঠ ছড়িয়ে আগুন জ্বেলে বললে, কোন জীবজন্তু আর আগুন পেড়িয়ে এগিয়ে আসতে পারবে না। তোমরা দুজনে এখন ঘুমোও—আমি জেগে পাহারা দি। আমার পর কুমারের পালা, তারপর রামহরির।

ছাতকের ডাক-বাংলোর সেই ব্যাপারের পর থেকে রোজ রাত্রেই আমরা এমনি পালা করে পাহারা দি।

আমি আর রামহরি গায়ের কাপড় মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম।. মাঝরাত্রে বিমল আমাকে ঠেলে তুলে বললে, কুমার, এইবার তোমার পালা?

শীতের রাত্রে লেপ ছাড়তে কি সাধ যায়—বিশেষ এই বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে! কিন্তু তবু উঠতে হল,—কি করি, উপায় তো আর নেই!

গুহার সামনের আগুন নিভে আসছিল, আরো খানকতক কাঠ তাতে ফেলে দিয়ে, কোলের উপরে বন্দুকটা নিয়ে দেয়াল ঠেসে বসলুম।

চাঁদ সেদিন মাঝরাত্রের আগেই অস্ত গিয়েছিল, বাইরে ঘুট-ঘুট করছে অন্ধকার। পাহাড়, বন, ঝোপঝাপ সমস্ত মুছে দিয়ে, জেগে আছে খালি অন্ধকারের এক সীমাহীন দৃশ্য, আর তারই ভিতর থেকে শোনা যাচ্ছে ঝরনার আশ্রান্ত ঝঝর, শতশত গাছের একটানা মর-মর, লক্ষ লক্ষ ঝিঝির একঘেয়ে ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ —।

হঠাৎ আর একরকম শব্দ শুনলুম। ঠিক যেন অনেকগুলো আঁতুড়ের শিশু কাঁদছে টেঁয়্যা—টেঁয়্যা—টেঁয়্যা !

আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠল, এই নিশুত রাতে, এমন বনবাদাড়ে এতগুলো মানুষের শিশু এল কোত্থেকে? একে আজ বিশ্রী একটা ভূতের গল্প শুনেছি, তার উপরে গহন বনের এক থমথমে অন্ধকার রাত্রি, তার উপরে আবার এই বেয়াড়া চীৎকার। মনের ভিতরে জেগে উঠল যত-সব অসম্ভব কথা।

আবার সেই অদ্ভূত কাঁদুনি।

আমার মনে হল এ অঞ্চলের যত ভূত-পেত্নী বাসা ছেড়ে চরতে বেরিয়ে গেছে, আর বাপ-মায়ের দেখা না পেয়ে ভুতুড়ে খোকারা এক সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে কান্নার কনসার্ট।

ভয়ে সিটিয়ে ভাবছি—আর একটু কোণ ধে সে বসা যাক, এমন সময়ে—ও কি ও!

গুহার বাইরে—অন্ধকারের ভিতরে দু'দুটো জ্বলন্ত কয়লার মতন চোখ একদৃষ্টিতে আমার পানে তাকিয়ে আছে।

বুক আমার উড়ে গেল—এ চোখছটো যে ঠিক সেই শ্মশানের পিশাচের মত ...এখানে পিশাচ আছে নাকি?

ধীরে ধীরে চোখদুটো আরো কাছে এগিয়ে এসে আবার স্থির হয়ে রইল। আমার মনে হল, আঁধার সমুদ্রে সাঁতার কাটছে যেন ফুটে আগুন-ভাটা।

আমি আর চুপ করে বসে থাকতে পারলুম না—ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বন্দুকটা কোন রকমে তুলে ধরে দিলুম তার ঘোড়া টিপে—গুড় ম করে ভীষণ এক আওয়াজ হল,—সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত চোখদুটে গেল নিবে।

বন্দুকের শব্দে বিমল, রামহরি আর বাঘ। একসঙ্গেই জেগে উঠল, বিমল ব্যস্ত হয়ে বললে—কুমার, কুমার, ব্যাপার কি?

আমি বললুম, পিশাচ, পিশাচ।

—পিশাচ কি হে?

—হ্যাঁ, ভয়ানক একটা পিশাচ এসে ফুটে জ্বলন্ত চোখ মেলে আমার পানে তাকিয়েছিল, আমি তাই বন্দুক ছুড়েছি?

বিমল তখনি আমার হাত থেকে বন্দুকটা টেনে নিলে। তারপর একহাতে লণ্ঠন, আর একহাতে বন্দুক নিয়ে আগুন টপকে গুহার বাইরে গিয়ে চারিদিকে তন্ন তন্ন করে দেখে এসে বললে, কোথাও কিছু নেই। ভূতের গল্প শুনে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে কুমার, তুমি ভুল দেখেছ?

এমন সময় আবার সেই ভূতুড়ে খোকারা কোত্থেকে কেঁদে উঠল। আমি মুখ শুকিয়ে বললুম, ঐ শোনো?

—কি?

—ভূতেদের খোকার কাঁদছে। রামহরি, তুমিও শুনেছ তো?

বিমল আর রামহরি দুজনেই একসঙ্গে হে হে করে হাসি শুরু করে দিলে।

আমি রেগে বললুম, তোমরা হাসছ যে? এ কি হাসির কথা?

বিমল হাসতে হাসতে বললে, শহরের বাইরে তো কখনো পা দাওনি, শহর ছাড়া দুনিয়ার কিছুই জানো না—এখনো একটি আস্ত বুড়ো খোকা হয়ে আছ। যা শুনছ, তা ভূতেদের খোকার কান্না নয়, বকের ছানার ডাক।

—বকের ছানার ডাক?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। কাছেই কোন গাছে বকের বাস আছে। বকের ছানার ডাক অনেকটা কচিছেলের কান্নার মত।

বেজায় অপ্রস্তুত হয়ে গেলুম। কিন্তু সেই জ্বলন্ত চোখদুটো তো মিথ্যে নয়। বিমল যতই উড়িয়ে দিক, আমি স্বচক্ষে দেখেছি—আর আমি যে ভুল দেখিনি, তা দিব্যি-গেলে বলতে পারি। কিন্তু আজ যে-রকম বোকা বনে গেছি, তাতে এদের কাছে সে ব্যাপার নিয়ে আপাততঃ কোন উচ্চবাচ্য না করাই ভালো।

পিশাচ রহস্য

পরের দিন সকালে উঠে দেখি, আর এক মুস্কিল। রামহরির কম্প দিয়ে জ্বর এসেছে। কাজেই সেদিন আমাদের সেখানেই থেকে যেতে হল—জ্বর-গায়ে রামহরি তো আর পথ চলতে পারে না! ক্রমাগত পথ চলে চলে আমাদেরও শরীর বেশ কাহিল হয়ে পড়েছিল, কাজেই এই হঠাৎ-পাওয়া ছুটিটা নেহাৎ মন্দ লাগল না।

সেদিনও বিমল দুটে পাখি মেরে আনলে, নিজের হাতেই আমরা রান্নার কাজটা সেরে নিলুম।

সন্ধ্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালকের রাতের সেই ভুতুড়ে ব্যাপারটার কথা আবার আমার মনে পড়ে গেল। বিমলের কাছে সে কথা তুলতে-না-তুলতেই সে হেসেই সব উড়িয়ে দিল। আমি কিন্তু অত সহজেই মনটাকে হালকা করে ফেলতে পারসুম না— আমি যে স্বচক্ষে দেখেছি। ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, বাপ রে!

সেদিনও সরল কাঠের আগুন জেলে গুহার মুখটা আমরা বন্ধ করে দিলুম। আজ রামহরির অমুখ,—কাজেই আমাদের দু'জনকেই পাল করে পাহারা দিতে হবে। আজও প্রথম রাতে পাহারার ভার নিলে বিমল নিজে।

যখন আমার পালা এল, তখন গভীর রাত্রি। আজও চাঁদ ডুবে গেছে, আর অন্ধকারে বুকের ভিতর থেকে নানা অস্ফুট ধ্বনির সঙ্গে শোনা যাচ্ছে সেই গাছের পাতার মর্মরানি, ঝরনার ঝরঝরানি আর বকের ছানাদের কাতরানি।

গুহার মুখের আগুনটা কমে আসছে দেখে আমি কতকগুলো চ্যালাকাঠ তার ভিতরে ফেলে দিলুম। তারপরেই শুনলুম কেমন একটা শব্দ-গুহার বাইরে কে যেন খড়মড় করে শুকনে পাঙা মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রাণপণে তাকিয়েও সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বিন্দুবিসর্গ কিছুই দেখতে পেলুম না, শব্দটাও একটু পরে থেমে গেল।

কিন্তু আমার বুক চিপ ঢিপ করতে লাগল।

বাঘা মনের সুখে কুণ্ডুলী পাকিয়ে, পেটের ভিতরে মুখ গুজে ঘুমোচ্ছিল, আমি তাকে জাগিয়ে দিলুম। বাঘা উঠে একটা হাই তুলে আর মাটির উপর একটা ডন দিয়ে নিয়ে, আমার পাশে এসে তুই থাবা পেতে বসল। একহাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হলুম।

আবার সেই শব্দ। বাঘার দিকে চেয়ে দেখলুম, সেও ছুই কান খাড়া করে ঘাড় বাকিয়ে শব্দটা শুনছে। তারপরেই সে একলাফে গুহার মুখে গিয়ে পড়ল, কিন্তু আগুনের জন্যে বাইরে যেতে না পেরে, সেইখানেই দাঁড়িয়ে গরগর করতে লাগল।

তার গজরানিতে বিমলের ঘুম ভেঙ্গে গেল, উঠে বসে সে বললে, আজ আবার কি ব্যাপার। বাঘা অমন করছে কেন?

আমি বললুম, বাইরে কিসের একটা শব্দ হচ্ছে, কে যেন চলে বেড়াচ্ছে?

সে কি কথা!—বলেই বিমল এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে বন্দুকটা নিয়ে বাগিয়ে ধরলে।

শব্দটা তখন থেমে গেছে—কিন্তু ও কি ও ! আবার যে সেই দুটো জলন্ত চোখ অন্ধকারের ভিতর থেকে কটমট করে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে !

বাঘা ঘেউঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল, আমিও বলে উঠলুম—দেখ বিমল, দেখ?

কিন্তু আমি বলবার আগেই বিমল দেখেছিল, সে মুখে কিছু বললে না, চোখদুটোর দিকে বন্দুকটা ফিরিয়ে একমনে টিপ করতে লাগল।

চোখদুটে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছিল—হঠাৎ বিমল বন্দুকের ঘোড় টিপে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে ধ্রুম্ করে শব্দ, আর একট। ভীষণ গর্জন, তারপরেই সব চুপ, চোখদুটোও আর নেই ।

বিমল আমার দিকে ফিরে বললে, এই চোখদুটোই কাল তুমি দেখেছিলে?

—হ্যাঁ । এইবার তোমার বিশ্বাস হল তো?

—তা হয়েছে বটে, কিন্তু এ পিশাচের নয়, বাঘের চোখ?

—বাঘ?

—'হ্যাঁ। বোধ হয় এতক্ষণে সে লীলাখেলা সাঙ্গ করেছে, তবু বলা তো যায় না, আজ রাত্রে আর বাইরে গিয়ে কাজ নেই-কি জানি একেবারে যদি মরে না থাকে—আহত বাঘ ভয়ানক জীব।

পরদিন সকালে উঠে দেখলুম–বিমল যা বলেছে তাই! গুহার মুখ থেকে খানিক তফাতে, পাহাড়ের উপরে একটা মরা বাঘ পড়ে রয়েছে—আমরা মেপে দেখলুম–পাকা ছয় হাত লম্বা বিমলের টিপ আশ্চর্য, বন্দুকের গুলি বাঘটার ঠিক কপালে গিয়ে লেগেছে।

মরণের মুখে

দিন-তিনেক পর রামহরির অসুখ সেরে গেল, আমাদেরও যাত্রা আবার সুরু হল। আবার আমরা পাহাড়ের পথ ধরে অজানা রহস্যের দিকে এগিয়ে চললুম।

বিমল বললে, আমি একটু এগিয়ে যাই, আজকের পেটের খোরাক যোগাড় করতে হবে তো,—পাখি-টাখি কিছু মেলে কিনা দেখা যাক।—এই বলে সে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে হনহন করে এগিয়ে চলল, খানিক পরেই আঁকাবাঁকা পথের উপরে আর তাকে দেখা গেল না—কেবল শুনতে পেলুম গলা ছেড়ে সে গান ধরেছে—

'আগে চল, আগে চল ভাই!
পড়ে থাকা পিছে মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই।

ক্রমে সে গানের আওয়াজও আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। রামহরির শরীর তখনে বেশ কাহিল হয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না, কাজেই আমাকে বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হল।

সেদিন সকালের রোদটি আমার ভারি ভালো লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন সারা পাহাড়ের বুকের উপরে কে কাঁচা সোনার মত মিঠে হাসি ছড়িয়ে দিয়েছে। হরেকরকম পাখির গানে চারিদিক মাৎ হয়ে আছে, গাছপালার উপরে সবুজের ঢেউ তুলে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আর এখানে-ওখানে আশেপাশে গোছা-গোছ। রঙিন বনফুল ফুটে, সোহাগে তুলে তুলে মাথা নেড়ে যেন বলছে—আমাদের নিয়ে মালা গাথা, আমাদের আদর কর, আমাদের মনে রেখ–ভুলো না?

কচি-কচি ফুলগুলিকে দেখে মনে হল, এরা যেন বনদেবীর খোকা-খুকি। আমি বেছে বেছে অনেক ফুল তুললুম, কিন্তু কত আর তুলব—এত ফুল দুনিয়ার কোন ধনীর মস্ত মস্ত বাগানেও যে ধরবে না।

এমনি নানা জাতের ফুল এদেশের সব জায়গাতেই আছে। কিন্তু আমাদের স্বদেশ যে কত বড় ফুলের দেশ, আমরা নিজেরাই সে খবর রাখি না। আমরা বোকার মত হাত গুটিয়ে বসে থাকি, আর এই সব ফুলের ভাণ্ডার দু-হাতে লুট করে নিয়ে যায় বিদেশী সাহেবরা। তারপর বড় বড় শহরের বাজারে সেই সব ফুল চড়া দামে বিকিয়ে যায়—কেনে অবশ্ব সাহেবরাই বেশী। এ থেকেই বেশ বুঝতে পারি, আমাদের ব্যবসা-বুদ্ধি তো নেই-ই—তারপরে সবচেয়ে যা লজ্জার কথা, স্বদেশের জিনিসকে ও আমরা তাদর করতে শিখিনি।

এই ভাবতে ভাবতে পথ চলছি, হঠাৎ রামহরি বলে উঠল, ছোটবাবু, দেখুন—দেখুন!

আমি ফিরে বললুম, কি?

রামহরি আঙুল দিয়ে মাটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। পথের উপর একটা বন্দুক পড়ে রয়েছে। দেখেই চিনতে পারলুম, সে বিমলের বন্দুক।

দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, পথের মাঝখানে বন্দুক ফেলে বিমল গেল কোথায়? সে তো বন্দুক ফেলে যাবার পাত্র নয়।

ব্যাপারটা সুবিধের নয়, একটা কিছু হয়েছেই। তারপর মুখ তুলেই দেখি, বাঘা একমনে একটা জায়গা শুকছে, আর একটা কাতর কুইকুই শব্দ করছে।

এগিয়ে গিয়ে ভালো করে দেখি, সেখানে খানিকটা রক্ত চাপ বেঁধে রয়েছে।

রামহরি প্রায় কেঁদে ফেলে বললে, খোকাবাবু নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছেন।

আমি বললুম, হ্যাঁ। রামহরি, আমারও তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু কি বিপদ?

রামহরি বললে, কি করে বলব ছোটবাবু, এখানে যে বাঘভালুক সবই আছে।

আমি বললুম, বাঘে মানুষ খায় বটে, কিন্তু ব্যাগ নিয়ে তো যায় না! বিমল বাঘের মুখে পড়েনি, তাহলে বন্দুকের সঙ্গে তার ব্যাগটাও এখানে পড়ে থাকত।

—তবে খোকাবাবু কোথায় গেলেন? এই বলেই রামহরি চেঁচিয়ে বিমলকে ডাকবার উপক্রম করলে।

আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বললুম, চুপ, চুপ,—চেঁচিও না । আমার বিশ্বাস বিমল শত্রুর হাতে পড়েছে, আর শত্রুর কাছেই আছে, চ্যাঁচালে আমরাও এখনি বিপদে পড়ব।

—তাহলে উপায়?

—তুমি এইখানে একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে থাকে। বাঘাকেও ধরে রাখে, নইলে বাঘাও হয়তো চেঁচিয়ে আমাদের বিপদে ফেলবে। আমি আগে এদিক-ওদিক একবার দেখে আসি।

বাঘার গলায় শিকলি বেঁধে রামহরি পথের পাশেই একটা ঝোপের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসল।

প্রথমে কোনদিকে যাব আমি তা বুঝতে পারলুম না। কিন্তু একটু পরেই দেখলুম, খানিক তফাতে আরো রক্তের দাগ রয়েছে— আরো খানিক এগিয়ে দেখলুম আরো রক্তের দাগ। তৃতীয় দাগের পরেই একটা ঝোপের পাশে খুব সরু পথ, সেই পথের উপরে লম্বা দাগ—যেন কারা একটা মস্ত বড় মোট ধুলোর উপর দিয়ে টেনেহিচড়ে নিয়ে গিয়েছে।

আমি সেই সরু পথ ধরলুম—সে পথেও মাঝে মাঝে রক্তের দাগ দেখে বুঝতে দেরি লাগল না যে, এইদিকে গেলেই বিমলের দেখা পাওয়া যাবে।

কিন্তু বিমল বেঁচে আছে কি? এ রক্ত কার? তাকে ধরে নিয়ে গেলই বা কারা? সে কি ডাকাতের হাতে পড়েছে?-কিন্তু এসব কথার কোন উত্তর মিলল না।

আচম্বিতে আমার পা থেমে গেল—খুব কাছেই যেন কাদের গলা শোনা যাচ্ছে।

আমার হাতের বন্দুকটা একবার পরখ করে দেখলুম, তার ছুটে ঘরেই টোটা ভরা আছে। তারপর ঝোপের পাশে পাশে গুড়ি মেরে খুব সন্তর্পণে সামনের দিকে অগ্রসর হলুম।

আর বেশী এগুতে হল না—সরু পথট। যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে অল্প খানিকট। খালি জমি, তারপরেই পাহড়ের খাদ। —

যে দৃশ্য দেখলুম জীবনে তা ভুলব না। সেই খোলা জমির উপরে জন কয়েক লোক দাঁড়িয়ে আছে—তাদের একজনকে দেখেই চিনলুম সে করালী!

আর একদিকে পাহাড়ের খাদের ধারেই একট, বড় গাছ হেলে পড়েছে এবং তারই তলায় পড়ে রয়েছে বিমলের দেহ । তার মাথা ও মুখ রক্তমাখা, আর হাত ও কোমরে দড়ি বাঁধা। বিমলের উপরে হুমড়ি খেয়ে বসে আছে করালীর দলের আর-একটা লোক।

শুনলুম, করালী চেঁচিয়ে বলছে, 'বিমল, এখনো কথার জবাব দাও। তোমার ব্যাগের ভেতরে পকেট-বই নেই, সেখান কোথায় আছে বল।

কিন্তু বিমল কোন উত্তর দিলে না। —তাহলে তুমি মরতে চাও?

বিমল চুপ।

করালী বললে, শম্ভু!

যে লোকটা দড়ি ধরেছিল, মুখ ফিরিয়ে বললে, 'আজ্ঞে।

লোকটাকে চিনলুম, ছাতকের ডাক-বাংলোয় দেখেছিলুম। করালী বললে, দেখ শম্ভু, আর একমিনিটের মধ্যে বিমল যদি আমার কথার জবাব না দেয়, তবে তুমি ওকে তুলে খাদের ভেতরে ছুড়ে ফেলে দিও।

কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল, আমার বুকটা ধুকপুক করতে লাগল, কি যে করব কিছুই স্থির করতে পারলুম না।

করালী বললে, "বিমল, এই শেষবার তোমাকে বলছি। যদি সাড়া না দাও, তবে তোমার কি হবে বুঝতে পারছ তো? একেবারে হাজার ফুট নীচে পড়ে তোমার দেহ গুড়িয়ে ধুলো হয়ে যাবে, একটু চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না।

বিমল তেমনি বোবার মতন রইল। আর এ দৃশ্য সহ করা অসম্ভব। ঠিক করলুম করালী যা জানতে চায়, আমিই তার সন্ধান দেব! কাজ নেই আর যকের ধনে, টাকার চেয়ে প্রাণ ঢের বড় জিনিস। মনস্থির করে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

করালী বললে, বিমল, এখনো তুমি চুপ করে আছ? এতক্ষণ পরে বিমল বললে, পকেট-বই পেলেই তো তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে?

করালী বললে, নিশ্চয়।

বিমল বললে, ব্যাগের মধ্যে আমার একটা জামার ভেতরদিককার পকেট খুঁজলেই তুমি পকেট-বই পাবে।

ব্যাগটা করালীর সামনেই পড়ে ছিল, সে তখনই তার ভিতরে হাত পুরে দিল। একটু চেষ্টার পরেই পকেট-বই বেরিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে করালীর মুখে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠল। কিন্তু এ হাসি দেখে এত বিপদেও আমার হাসি পেল। কারণ আমি জানি, পকেট-বই থেকে পথের ঠিকানার কথা বিমল আগেই মুছে দিয়েছে। এত বিপদেও বিমল ভয় পেয়ে বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেনি, —ধণ্যি ছেলে যা হোক।

বিমল বললে, তোমাদের মনের আশা তো পূর্ণ হল, এইবার আমাকে ছেড়ে দাও।

করালী কর্কশ স্বরে বললে, 'হ্যাঁ, ছেড়ে দেব বৈকি—শত্রুর শেষ রাখব না। শম্ভু, আর কেন, ছোড়াকে নিশ্চিন্তপুরে পাঠিয়ে দাও।

বিমল চেঁচিয়ে বলে উঠল, করালী! শয়তান! তুমি— কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই শম্ভু বিমলকে ধরে হিড়হিড় করে টেনে খাদের ধারে নিয়ে গিয়ে একেবারে ঠেলে ফেলে দিলে এবং চোখের পলক না পড়তেই বিমলের দেহ ঝুপ করে নীচের দিকে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের উপরে একটা অন্ধকারের পর্দা নেমে এল বা মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে যেতে যেতে আবার আমি শুনলুম —করালীর সেই ভীষণ অট্টহাসি ...তারপরেই আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

অবাক কাণ্ড

কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলুম জানি না। যখন জ্ঞান ল, চোখ চেয়ে দেখলুম, রামহরি আমার মুখের উপরে হুমড়ি খেয়ে আছে। আমাকে চোখ চাইতে দেখে সে হাঁপ ছেড়ে বললে, কি হয়েছে ছোটবাবু, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে কেন?

কেন যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলুম, প্রথমটা আমার তা মনে পড়ল না—আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলুম-একেবারে বোবার মত।

রামহরি বললে, তোমার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে আমার ভারি ভয় হল। বাঘাকে সেইখানেই বেঁধে রেখে তোমাকে খুঁজতে আমিই এইদিকে এলুম—

এতক্ষণে আমার সব কথা মনে পড়ল—রামহরিকে বাঁধা দিয়ে পাগলের মত লাফিয়ে উঠে বললুম—রামহরি, রামহরি-আমিও ওদের খুন করব।

রামহরি আশ্চর্য হয়ে বললে, কাদের খুন করবে ছোটবাবু, তুমি কি বলছ!

বন্দুকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে আমি বঙ্গলুম, যারা বিমলকে খাদে ফেলে দিয়েছে।

—খোকাবাবুকে খাদে ফেলে দিয়েছে। অ্যাঁ—অ্যাঁ, রামহরি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি বললুম, এখন তোমার কান্না রাখো রামহরি। এখন আগে চাই প্রতিশোধ। নাও, ওঠ—বিমলের বন্দুকটা নিয়ে এইদিকে এস। আমি ঝোপ থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালুম-ঠিক করলুম সামনে যাকে দেখব তাকেই গুলি করে মেরে ফেলব কুকুরের মত।

কিন্তু কেউ তো কোথাও নেই। খাদের পাশে খোলা জমি ধু-ধু করছে—সেখানে জনপ্রাণীকেও দেখতে পেলুম না।

রামহরি পিছন থেকে বললে, তুমি কাকে মারতে চাও ছোটবাবু?

দাঁতে দাঁত ঘষে আমি বললুম, কেরালীকে। কিন্তু এর মধ্যেই দলবল নিয়ে সে কোথায় গেল?

—করালী—স্তম্ভিত রামহরির মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না।

—হ্যাঁ রামহরি, করালী। তারই হুকুমে বিমলকে ফেলে দিয়েছে?

রামহরি কঁদিতে কাঁদতে বললে, কোনখানে খোকাবাবুকে ফেলে দিয়েছে?

আমারও গলা কান্নায় বন্ধ হয়ে এল। কোনরকমে সামলে নিয়ে হতাশভাবে আমি বললুম, রামহরি, বিমলের খোজ নেওয়া আর মিছে।...ঐখান থেকে হাত-পা বেঁধে তাকে খাদের ভেতর ফেলে দিয়েছে। অত উঁচু থেকে ফেলে দিলে লোহাই গুড়ো হয়ে যায়, মামুষের দেহ তো সামান্ত ব্যাপার। বিমলকে আর আমরা দেখতে পাব না।

রামহরি মাথায় করাঘাত করে বললে, খোকাবাবু সঙ্গে না থাকলে কোন মুখে আবার মা-ঠাকুরুণের কাছে গিয়ে দাঁড়াব? না, এ প্রাণ আমি রাখব না। আমিও পাহাড়ের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে মরব। এই বলে সে খাদের ধারে ছুটে গেল।

অনেক কষ্টে আমি তাকে থামিয়ে রাখলুম। তখন সে মাটির উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

যেখান থেকে বিমলকে নীচে ফেলে দিয়েছে, আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর ধারের দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলুম, বিমলের দেহটা নজরে পড়ে কিনা।

নীচের দিকে তাকাতেই আমার মাথা ঘুরে গেল। উঃ, এমন গভীর খাদ জীবনে আমি কখনো দেখিনি—ঠিক খাড়াভাবে নীচের দিকে কোথায় যে তলিয়ে গেছে, তা নজরেই ঠেকে না! তলার দিকটা একেবারে ধোঁয়া ধোঁয়া—অস্পষ্ট!

হঠাৎ একটা অদ্ভূত জিনিস আমার চোখে পড়ল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে হাত পনেরো নীচেই পাহাড়ের খাড়া গায়ে একটা বুনো

গাছের পুরু ঝোপ দেখা যাচ্ছে,--আর—আর সেই ঝোপের উপরে কি ও-টা? — ও যে মানুষের দেহের মত দেখতে।

প্রাণপণে চেঁচিয়ে আমি বললুম, রামহরি, রামহরি, দেখবে এস?

রামহরি তাড়াতাড়ি ছুটে এল—সঙ্গে সঙ্গে ঝোপের উপরে দেহটাও নড়ে উঠল।

আমি ডাকলুম, বিমল, বিমল?

নীচে থেকে সাড়া এল, কুমার, এখনো আমি বেঁচে আছি ভাই?

আবার আমি অজ্ঞানের মত হয়ে গেলুম—আনন্দের প্রচণ্ড আবেগে। রামহরি তো আমোদে আটখানা হয়ে নাচ সুরু করে দিলে। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ করে আমি বললুম, রামহরি, ধেই ধেই করে নাচলে তো চলবে না, আগে বিমলকে ওখান থেকে তুলে আনতে হবে যে।

রামহরি তখনি নাচ বন্ধ করে, চোখ কপালে তুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, তাই তো ছোটবাবু, ওখানে আমরা কি করে যাব, নামবার যে কোন উপায় নেই?

উঁকি কি মেরে দেখলুম বিমলের কাছে যাওয়া অসম্ভব—পাহাড়ের গা বেয়ে মানুষ তো আর টিকটিকির মত নীচে নামতে পারে না! ওদিকে বিমল যে-রকম বেকায়দায় হাজার ফুট নীচু খাদের তুচ্ছ একটা ঝোপের উপরে আটকে আছে—

এমন সময়ে নীচে থেকে বিমলের চীৎকার আমার ভাবনায় বাধা দিলে। শুনলুম, বিমল চেঁচিয়ে বলছে, কুমার, শীগগির আমাকে তুলে নাও,—আমি ক্রমেই নীচের দিকে সরে যাচ্ছি।

তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে আমি বললুম, কিন্তু কি করে তোমার কাছে যাব বিমল?

বিমল বললে, আমার ব্যাগের ভেতরে দড়ি আছে, সেই দড়ি আমার কাছে নামিয়ে দাও।

—কিন্তু তোমার হাত-পা যে বাঁধা, দড়ি ধরবে কেমন করে?

—কুমার, কেন মিছে সময় নষ্ট করছ, শীগগির দড়ি ঝুলিয়ে দাও।

বিমলের ব্যাগটা সেইখানেই পড়ে ছিল— ভাগ্যে করালীরা সেটাও নিয়ে যায়নি। রামহরি তখনই তার ভিতর থেকে খানিকটা মোট দড়ি বার করে আনলে।

জোর বাতাস বইছে আর প্রতি দমকাতেই ঝোপটা দুলে দুলে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিমলের দেহ নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। কি ভয়ানক অবস্থা তার! আমার বুকটা ভয়ে ঢিপ ঢপ করতে লাগল।

বিমল বললে, দড়িটা ঠিক আমার মুখের কাছে ঝুলিয়ে দাও। আমি দাঁত দিয়ে দড়িটা ভালো করে কামড়ে ধরলে পর তোমরা দুজনে আমাকে ওপরে টেনে তুলো।

আমি একবার সার্কাসে একজন সাহেবকে দাঁত দিয়ে আড়াই মণ ভারি মাল টেনে তুলতে দেখেছিলুম। জানি বিমলের গায়ে খুব জোর আছে, কিন্তু তার দাত কি তেমন শক্ত হবে?

হঠাৎ বিষম একটা ঝোড়ো বাতাস এসে ঝোপের উপরে ধাক্ক। মেরে বিমলের দেহকে আরো খানিকটা নীচের দিকে নামিয়ে দিলে— কোনরকমে দেহটাকে বাঁকিয়ে-চুরিয়ে বিমল একরকম আলগোছেই শূণ্যে ঝুলতে লাগল। তার প্রাণের ভিতরটা তখন যে কি রকম করছিল, সেট। তার মড়ার মত সাদা মুখ দেখেই বেশ বুঝতে পারলুম। হাওয়ার আর একটা দমকা এলেই বিমলকে কেউ আর বাঁচাতে পারবে না।

তাড়াতাড়ি দড়ি ঝুলিয়ে দিলুম–একেবারে বিমলের মুখের উপরে। বিমল প্রাণপণে দড়িটা কামড়ে ধরলে।

আমি আর রামহরি দুজনে মিলে দড়ি ধরে টানতে লাগলুম— দেখতে দেখতে বিমলের দেহ পাহাড়ের ধারের কাছে উঠে এল; তার মুখ তখন রক্তের মতন রাঙা হয়ে উঠেছে—সামান্য দাঁতের জোরের উপরেই আজ নির্ভর করছে তার বাঁচন-মরণ!

রামহরি বললে, ছোটবাবু, তুমি একবার একলা দড়িটা ধরে থাকতে পারবে? আমি তাহলে খোকাবাবুকে, হাতে করে ওপরে তুলে নি?

আমি বললুম, পারব।

রামহরি দৌড়ে গিয়ে বিমলকে একেবারে পাহাড়ের উপরে, নিরাপদ স্থানে তুলে ফেললে। তারপর তাকে নিজের বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে আনন্দের আবেগে কাঁদতে লাগল। আমি গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিলুম।

বললুম, বিমল, কি করে তুমি ওদের হাতে গিয়ে পড়লে?

বিমল বললে, নিজের মনে গান গাইতে গাইতে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলুম, ওরা বোধহয় পথের পাশে লুকিয়ে ছিল, হঠাৎ পিছন থেকে আমার মাথায় লাঠি মারে, আর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

আমি বললুম, তারপর যা হয়েছে, আমি সব দেখেছি। তোমাকে যে আবার ফিরে পাব, আমরা তা একবারও ভাবতে পারিনি।

বিমল হেসে বললে, হ্যাঁ, এতক্ষণে নিশ্চয় আমি পরলোকে ভ্রমণ করতুম—কিন্তু ভাগ্যে ঠিক আমার পায়ের তলাতেই ঝোপটা ছিল। রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

আমি মিনতির স্বরে বললুম, বিমল, আর আমাদের যকের ধনে কাজ নেই—প্রাণ নিয়ে ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে যাই চল।

বিমল বললে, তেমন কাপুরুষ আমি নই। তোমার ভয় হয়, তুমি যাও । আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে এখান থেকে কিছুতেই নড়ব না?

গাছের ফাঁকে ফাঁড়া

আবার আমাদের চলা শুরু হয়েছে। এবারে আমরা প্রাণপণে এগিয়ে চলেছি। পিছনে যখন শত্রু লেগেছে, তখন যত তাড়াতাড়ি গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌছানো যায়, ততই মঙ্গল।

কত বন-জঙ্গল, কত ঝরনা, খাদ, কত পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়েই যে আমরা চলেছি আর চলেছি, তাঁর আর কোন ঠিকানা নেই। মাঝে মাঝে আমার মনে হতে লাগল, আমরা যেন চলবার জন্যেই জন্মেছি, আমরা যেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত খালি চলবই আর চলবই। দুপুরবেলায় পাহাড় যখন উনুনে পোড়ানো চাটুর মত বিষম তেতে ওঠে, কেবল সেই সময়টাতেই আমরা চলা থেকে রেহাই পেয়ে রেঁধে-খেয়ে কিছুক্ষণ গড়িয়ে নি। রাত্রে জ্যোৎস্না না থাকলে দায়ে পড়ে আমাদের বিশ্রাম করতে হয়। নইলে চলতে চলতে রোজ আমরা দেখি,—আকাশে উষার রঙিন আভাস মস্ত এক ফাগের থালার মতন প্রথম সূর্যের উদয়, বনের পাখির ডাকে সারা পৃথিবীর জাগরণসন্ধ্যার আভাসে মেঘে মেঘে রামধমুকের সাত-রঙ সমারোহের মধ্যে সূর্যের বিদায়, তারপর পরীলোক-থেকে-উড়িয়ে দেওয়া ফামুসের মত চাদের প্রকাশ। আবার, সেই চাঁদই কতদিন আমাদের চোখের সামনেই ক্রমে ম্লান হয়ে প্রভাতের সাড়া পেয়ে মিলিয়ে যায়,—ঠিক যেন স্বপ্নের মায়ার মতন।

কিন্তু করালীর আর দেখা নেই কেন? এতদিনে আবার তার সঙ্গে আমাদের দেখা হওয়া উচিত ছিল—কারণ এখন সে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে যে, পকেট-বইয়ে পথের কোন ঠিকানাই লেখা নেই। সে কি হতাশ হয়ে আমাদের পিছন ছেড়ে সরে পড়েছে, না আবার কোনদিন হঠাৎ কালবোশেখীর মতই আমাদের সামনে এসে মূর্তিমান হবে?

এমনিভাবে দিনরাত চলতে চলতে শেষে একদিন আমরা রূপনাথের গুহার স্বমুখে এসে দাঁড়ালুম। শুনেছি এই গুহার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হলে সুদূর চীনদেশে গিয়ে হাজির হওয়া যায়। একবার এক চীন-সম্রাট নাকি এই পথ দিয়েই ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে এসেছিলেন। অবশ্য, এটা ইতিহাসের কথা নয়, প্রবাদেই এ কথা বলে । রূপনাথের গুহা বড় হোক আর ছোট হোক তাতে কিছু এসে যায় না, আর তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকারও নেই। কিন্তু এখানে এসে আমরা আশ্বস্তির হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম—কেননা এতদিন আমরা এই গুহার উদ্দেশেই এগিয়ে আসছিলুম এবং এখানে পৌছে অন্ততঃ এইটুকু বুঝতে পারলুম যে, এইবারে আমরা নিশ্চয়ই পথের শেষ দেখতে পাব। কারণ যে জায়গায় যকের ধন আছে, এখান থেকে সে জায়গাটা খুবই কাছে—মাত্র দিন-তিনেকের পথ।

বিমল হাসিমুখে একটা গাছতলায় বসে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

আমি তার পাশে গিয়ে বসে বললুম, বিমল, এখনি অতটা স্ফূতি ভালো নয়!

বিমল ভুরু কুঁচকে বললে, কেন?

—মনে কর, বৌদ্ধমঠে গিয়ে যদি আমরা দেখি যে, যকের ধন সেখানে নেই,—তাহলে?

—কেনই বা থাকবে না?

—যে সন্ন্যাসী আমার ঠাকুরদাদাকে মড়ার মাথা দিয়েছিল, সে যে বাজে কথা বলেনি, তার প্রমাণ?

—না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস সন্ন্যাসী সত্যকথাই বলেছে। অকারণে মিছেকথা বলে তার কোন লাভ ছিল না তো!

আমি আর কিছু বললুম না।

বিমল বললে, ও-সব বাজে ভাবনা ভেবে মাথা খারাপ কোরো না। আপাততঃ আজকের মত এখানে বসেই বিশ্রাম কর। তারপর কাল আবার আমরা বৌদ্ধমঠের দিকে চলতে সুরু করব।

সূর্য অস্ত গিয়েছে। কিন্তু তখনো সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। পশ্চিমের আকাশে রঙের খেলা তখনো মিলিয়ে যায়নি—দেখলে। মনে হয়, কারা যেন মেঘের গায়ে নানা রঙের জলছবি মেরে দিয়ে গেছে।

সেদিনের বাতাসটি আমার ভারি মিষ্টি লাগছিল। বিমল নিজের মনে গান গাইছে, আর আমি চুপ করে বসে শুনছি—তার গান বাস্তবিকই শোনবার মত। এইভাবে খানিকক্ষণ কেটে গেল।

হঠাৎ সামনের জঙ্গলের দিকে আমার চোখ পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল।

আমি বেশ দেখলুম, একটা গাছের আড়াল থেকে করালীর কুৎসিত মুখখান উঁকি মারছে! কুতকুতে চোখ দুটো তার গোখরো সাপের মত তীব্র হিংসায় ভরা। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হবামাত্র মুখখানা বিদ্যুতের মত সাৎ করে সরে গেল।

আমি তাড়াতাড়ি বিমলের গা টিপলুম, বিমল চমকে গান থামিয়ে ফেললে।

চুপিচুপি বললুম, করালী ! বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, কৈ?

আমি সামনের জঙ্গলের গাছটার দিকে দেখিয়ে বললুম, ঐখানে? বিমল তখনি সেইদিকে যাবার উপক্রম করলে। কিন্তু আমি বাধা দিয়ে বললুম, না, যেও না। হয়তো করালীর লোকেরাও ওখানে লুকিয়ে আছে। আচমকা বিপদে পড়তে পারে।

বিমল বললে, ঠিক বলেছ। কিন্তু আমি যে আর থাকতে পারছি না, কুমার। আমার ইচ্ছে হচ্চে, এখনি ছুটে গিয়ে শয়তানের টুটি টিপে ধরি।

আমি বললুম, না, না, চল, আমরা এখান থেকে সরে পড়ি। করালী ভাবুক, আমরা ওদের দেখতে পাইনি। তারপরে ভেবে দেখা যাবে আমাদের কি করা উচিত।

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে আমরা সেখান থেকে চলে এলুম। বেশ বুঝলুম, করালী যখন আমাদের এত কাছে কাছে আছে, তখন কোন-না-কোন দিক দিয়ে একটা নতুন বিপদ আসতে আর বড় দেরি নেই। যকের ধনের কাছে এসেছি বলে আমাদের মনে যে আনন্দের উদয় হয়েছিল, করালীর আবির্ভাবে

সেটা আবার কর্পূরের মতন উবে গেল। কি মুস্কিল, এই রাহুর গ্রাস থেকে কি কিছুতেই আমরা ছাড়ান পাব না?

পথের বাধা

কি তুর্গম পথ! কখনো প্রায় খাড়া উপরে উঠে গেছে, কখনো পাহাড়ের শিখরের চারিদিকে পাক খেয়ে, আবার কখনো বা ঘুটফুটে অন্ধকার গুহার ভিতর দিয়ে পথটা সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এ পথে নিশ্চয় লোক চলে না, কারণ পথের মাঝে মাঝে এমন সব কাটাজঙ্গল গজিয়ে উঠেছে যে, কুড়ল দিয়ে কেটে না পরিস্কার করে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। ঠাকুরদাদার পকেট-বইয়ে যদি পথের ঠিকানা ভালো করে না লেখা থাকত, তাহলে নিশ্চয় আমরা এদিকে আসতে পারতুম না। পকেট-বইখানা এখন আমাদের কাছে নেই বটে, কিন্তু পথের বর্ণনা আমরা আলাদা কাগজে টুকে নিজেদের সঙ্গে সঙ্গেই রেখেছিলুম।

পথটা খারাপ বলে আমরা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতেও পাবছিলুম না বিশ মাইল পথ আমরা অনায়াসে একদিনেই পেরিয়ে যেতুম, কিন্তু এই পথটা পার হতে আমাদের ঠিক পাঁচদিন লাগল।

কাল থেকে মনে হচ্ছে, আমরা ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন মানুষ নেই। চারিদিক এত নির্জন আর এত নিস্তব্ধ যে, নিজেদের পায়ের শব্দে আমরা নিজেরাই থেকে থেকে চমকে উঠছি। মাঝে মাঝে বাঘা যেই ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে, আর আমন চারিধারে পাহাড়ে পাহাড়ে এমন বিষম প্রতিধ্বনি তে জেগে উঠছে যে, আমার মনে হতে লাগল, পাহাড়ের শিখরগুলো যেন হঠাৎ আমাদের পদশব্দে জ্যান্ত হয়ে ধমকের পর ধমক দিচ্ছে। পাখিগুলো পর্যন্ত আমাদের সাড়া পেয়ে কিচির-মিচির করে ডেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে পালাচ্ছে—যেন এ পথে আর কখনো তারা মানুষকে হাঁটতে দেখেনি।

পাঁচ দিনের দিন, সন্ধ্যার কিছু আগে, খানিক তফাৎ থেকে আমাদের চোখের উপরে আচম্বিতে এক অপূর্ব দৃশ্য ভেসে উঠল। সারি সারি মন্দিরের

মতন কতকগুলো বাড়ী- সমস্তই যেন মিশকালো রঙে তুলি ডুবিয়ে, আগুনের মত রাঙা আকাশের পটে কে একে রেখেছে। একটা উচু পাহাড়ের শিখরের উপরে মন্দিরগুলো গড়া হয়েছে। এই নিস্তব্ধতার রাজ্যে শিখরের উপরে মুকুটের মত সেই মন্দিরগুলোর দৃশ্য এমন আশ্চর্যরকম গম্ভীর যে, বিস্ময়ে আর সম্ভ্রমে খানিকক্ষণ আমরা আর কথাই কইতে পারলুম না।

সকলের আগে কথা কইল বিমল। মহা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল— বৌদ্ধমঠ!

আমিও বলে উঠলুম—যকের ধন?

রামহরি বললে, আমাদের এতদিনের কষ্ট সার্থক হল।

বাঘা আমাদের কথা বুঝতে পারলে না বটে, কিন্তু এটা অনায়াসে বুঝে নিলে যে, আমরা সকলেই খুব খুসি হয়েছি। সেও তখন আমাদের মুখের পানে চেয়ে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

আনন্দের প্রথম আবেগ কোনরকমে সামলে নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলুম। মঠ তখনো আমাদের কাছ থেকে প্রায় মাইল-খানেক তফাতে ছিল—আমরা প্রতিজ্ঞা করলুম, আজকেই ওখানে না গিয়ে কিছুতেই আর বিশ্রাম করব না।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে উঠল। বিমল আমাদের আগে আগে যাচ্ছিল। আচমকা সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল-- 'সর্বনাশ!

আমি বললুম, কি হল বিমল?

বিমল বললে, উঁঃ, মরতে মরতে ভয়ানক বেঁচে গেছি?

—কেন, কেন?

খবর্দার। আর এগিয়ে না, দাঁড়াও। এখানে পাহাড় ধ্বসে গেছে, আর পথ নেই?

মাথায় যেন বজ্র ভেঙে পড়ল—পথ নেই। বিমল বলে কি?

সাবধানে দু-চার পা এগিয়ে যা দেখলুম, তাতে মন একেবারে দমে গেল। পথের মাঝখানকার একটা জায়গা ধ্বসে গিয়ে গভীর এক ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে, ফাঁকের মুখটাও প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ফুট চওড়া। সেই ফাঁকের মধ্যেও নেমে যে পথের এদিক থেকে ওদিক দিয়ে উঠব, এমন কোন উপায়ও দেখলুম না। পথের দুপাশে যে খাড়া খাদ রয়েছে, তা এত গভীর যে দেখলেও মাথা ঘুরে যায়। এ কি বিড়ম্বন, এতদিনের পরে, এত বিপদ এড়িয়ে, যকের ধনের সামনে এসে শেষটা কি এইখান থেকেই বিফল হয়ে ফিরে যেতে হবে?

আমার সর্বাঙ্গ এলিয়ে এল, সেইখানেই আমি ধুপ করে বসে পড়লুম।

খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখলুম, ঠিক সেই ভাঙা জায়গাটার ধীরে একটা মস্ত উঁচু সরল গাছের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বিমল কি ভাবছে।

আমি বললুম, তার কি দেখছ ভাই, এখানে বসবে এস, আজ এইখানেই রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে, কাল আবার বাড়ীর দিকে ফিরব?

বিমল রাগ করে বললে, এত সহজেই যদি হাল ছেড়ে দেব, তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন?

আমি বললুম, হাল ছাড়ব না তো কি করব বল? লাফিয়ে তো আর ঐ ফাঁকটা পার হতে পারব না, ডানাও নেই যে, উড়ে যাব।

বিমল বললে, তোমাকে লাফাতেও হবে না, উড়তেও বলছি না। আমরা হেঁটেই যাব।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, হেঁটে! শূণ্য দিয়ে হেঁটে যাব কিরকম?

বিমল বললে, শোন বলছি। এই ফাঁকটার মাপ সতেরো আঠারো ফুটের বেশী হবে না, কেমন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, ভাঙা পথের ঠিক ধারেই যে সরল গাছটা রয়েছে, ওটা আন্দাজ কত ফুট উঁচু হবে বল দেখি?

—সতেরো-আঠারো ফুটের চেয়ে ঢের বেশী।

—বেশ, তাহলে আর ভাবনা কি? আমরা কুড়ল দিয়ে কুপিয়ে গাছের গোড়াটা এমনভাবে কাটব, যাতে করে পড়বার সময়ে গাছটা পথের ঐ ভাঙা অংশের ওপরেই গিয়ে পড়ে। তাহলে কি হবে বুঝতে পারছ তো?

আমি আহলাদে একলাফ মেরে বললুম, ওহে, বুঝেছি। গাছটা ভাঙা জায়গার ওপরে পড়লেই একটা পোলের মত হবে। তাহলেই তার ওপর দিয়ে আমরা ওধারে যেতে পারব। বিমল, তুমি হচ্ছ বুদ্ধির বৃহস্পতি! তোমার কাছে আমরা এক একটি গরুবিশেষ।

বিমল বললে, বুদ্ধি সকলেরই আছে, কিন্তু কাজের সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সকলেই সমানভাবে বুদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না বলেই তো মুস্কিলে পড়তে হয় ...যাক, আজ আমাদের এইখানেই বিশ্রাম। কাল সকালে উঠেই আগে গাছটা কাটবার ব্যবস্থা করতে হবে।

বাধার উপরে বাধা

গভীর রাত্রি। একটা ঝুঁকে-পড়া পাহাড়ের তলায় আমরা আশ্রয় নিয়েছি। আমাদের দিকে পাহাড় আর দুদিকে আগুন। বিমল আর রামহরি ঘুমাচ্ছে আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি— কিন্তু ঘুমোইনি, কারণ এখন আমার পাতার দেবার পালা।

চাঁদের আলোর আজ আর তেমন জোর নেই; চারিদিকে আলো আর অন্ধকার যেন একসঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

হঠাৎ বৌদ্ধমঠে যাবার পথের উপর দিয়ে খেয়ালের মত কি একটা জানোয়ার বারবার পিছনে তাকাতে তাকাতে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল—দেখলেই মনে হয় সে যেন কোন কারণে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

মনে কেমন সন্দেহ হল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলুম বটে, কিন্তু চোখের কাছে একটু ফাঁক রাখলুম,—আর বন্দুকটাও কাপড়ের ভিতরেই বেশ করে বাগিয়ে ধরলুম।

এক, দুই, তিন মিনিট। তারপরেই দেখলুম, পাহাড়ের আড়াল থেকে উপরে একটা মানুষ বেরিয়ে এল...তারপর আর একজন... তারপর আরো একজন—তারপর একসঙ্গে দুইজন। সবশুদ্ধ পাঁচজন লোক!

আস্তে আস্তে চোরের মতন আমাদের দিকে তারা এগিয়ে আসছে। যদিও রাতের আবছায়ায় তফাৎ থেকে তাদের চিনতে পারলুম না— তবুও আন্দাজেই বুঝে নিলুম, তার কারা।

সব-আগের লোকটা আমাদের অনেকটা কাছে এগিয়ে এল। আমাদের সামনেকার আগুনের আভা তার মুখের উপরে গিয়ে পড়তেই চিনলুম—সে করালী!

একটা নিষ্ঠুর আনন্দে বুকটা আমার নেচে উঠল। এই করালী! এরই জন্যে কত বিপদে পড়তে হয়েছে, কতবার প্রাণ যেতে যেতে বেঁচে গেছে, এখনো এ আমাদের যমের বাড়ী পাঠাবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে; ধরি ধরি করেও কোনবারেই একে আমরা ধরতে পারিনি— কিন্তু এবারে আর কিছুতেই এর ছাড়ান নেই।

বন্দুকট তৈরী রেখে একেবারে মড়ার মত আড়ষ্ট হয়ে পড়ে রইলুম। করালী আরো কাছে এগিয়ে আসুক না,—তারপরেই তার মুখের স্বপ্ন জন্মের মত ভেঙে দেব!

পা টিপে-টিপে করালী ক্রমে আমাদের কাছ থেকে হাত পনেরো-ষোলো তফাতে এসে পড়ল—তার পিছনে পিছনে আর চারজন লোক।

আগুনের আভায় দেখলুম, করালীর সেই কুৎসিত মুখখান আজ রাক্ষসের মতই ভয়ানক হয়ে উঠেছে। তার ডানহাতে একখানা মস্ত বড় চকচকে ছোরা, এখান নিশ্চয়ই সে আমাদের বুকের উপরে বসাতে চায়। তার পিছনের লোকগুলোরও প্রত্যেকেরই হাতে ছোরা, বর্শা বা তরোয়াল রয়েছে। এটা আমাদের খুব সৌভাগ্যের কথা যে, করালীর কেউ বন্দুক জোগাড় করে আনতে পারেনি। তাদের সঙ্গে বন্দুক থাকলে এতদিন নিশ্চয়ই আমরা বেঁচে থাকতে পারতুম না।

করালী আমাদের আগুনের বেড়াটা পেরিয়ে আসবার উদ্যোগ করলে।

বুঝলুম, এই সময়। বিদ্যুতের মতন আমি লাফিয়ে উঠলুম— তারপর চোখের পলক ফেলবার আগেই বন্দুকটা তুলে দিলুম একেবারে ঘোড়া টিপে। গুড়ুম।

বিকট এক চীৎকার করে করালী মাথার উপর দু-হাত তুলে মাটির উপরে ঘুরে পড়ে গেল।

তার পিছনের লোকগুলো হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তাদের দিকেও তার একবার বন্দুক ছুড়তেই তারা প্রাণের ভয়ে পাগলের মত দৌড়ে পালাল।

কিন্তু বন্দুকের গুলি বোধ হয় করালীর গায়ে ঠিক জায়গায় লাগেনি, কারণ মাটির উপরে পড়েই সে চোখের নিমেষে উঠে দাঁড়াল —তারপর প্রাণপণে ছুটে অন্ধকারে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার দোনলা বন্দুকে আর টোটা ছিল না, কাজেই তাকে আর বাধা দিতেও পারলুম না।

কয় সেকেণ্ড পরে ভীষণ এক আর্তনাদে নিস্তব্ধ রাত্রির আকাশ যেন কেঁপে উঠল—তেমন আর্তনাদ আমি জীবনে আর কখনো শুনিনি। তারপরেই আবার সব চুপচাপ —ও আবার কি ব্যাপার?

মিনিটখানেকের মধ্যেই এই ব্যাপারগুলো হয়ে গেল। ততক্ষণে গোলমালে বিমল, রামহরি আর বাঘাও জেগে উঠেছে।

বিমলকে তাড়াতাড়ি দু-কথায় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে বললুম, কিন্তু ঐ আর্তনাদ যে কেন হল বুঝতে পারছি না। আমার মনে হল একসঙ্গে যেন জন-তিনেক লোক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

বিমল সভয়ে বললে, কি ভয়ানক! নিশ্চয়ই অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে তারা ভাঙা পথের সেই ফাঁকের মধ্যে পড়ে গেছে। তারা কেউ আর বেঁচে নেই।

আমি বললুম, কিন্তু করালী ওদিকে যায়নি—সে এখনো বেঁচে আছে।

রামহরি বললে, আহা, হতভাগাদের জন্যে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে, শেষটা অপঘাতে মরল!

বিমল বললে, যেমন কর্ম, তেমনি ফল—দুঃখ করে লাভ নেই। করালীর যদি এখনো শিক্ষা না হয়ে থাকে, তবে তার কপালেও অপঘাত মৃত্যু লেখা আছে।

আমি বললুম, 'অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যে আমরা নিশ্চয় করালীর দেখা পাব না। সে মরেনি বটে, কিন্তু রীতিমত জখম যে হয়েছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই?

বিমল বললে, আর তিনদিন যদি বাধা না পাই, তাহলে যকের ধন আমাদের মুঠোর ভিতর এসে পড়বেই—এ আমি তোমাকে বলে দিলুম।

আমি হেসে বললুম, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

অলৌকিক কাণ্ড

সেই সকাল থেকে আমরা ভাঙা জায়গাটার ধারে গিয়ে সরল গাছের গোড়ার উপরে ক্রমাগত কুড়লের ঘা মারছি আর মারছি। এমনভাবে আমরা গাছ কাটছি, যাতে করে পড়বার সময়ে সেটা ঠিক ভাঙা জায়গার উপরে গিয়ে পড়ে। দুপুরের সময় গাছটা পড় পড় হল। আমরা খুব সাবধানে কাজ করতে লাগলুম, কারণ আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা এখন এই গাছটার উপরেই নির্ভর করছে—একটু এদিক-ওদিক হলেই সকলকে ধুলে-পায়েই বাড়ীর দিকে ফিরতে হবে।

গাছটা পড়তে আর দেরি নেই, তার গোড়া মড়মড় করে উঠল।

বিমল বললে, আর গোটাকয়েক কোপ। ব্যাস, তাহলেই কেল্লা ফতে।

টিপ করে ঠিক গোড়া ঘেসে মারলুম আরো বার কয়েক কুড়লের ঘা।

বিমল বলে উঠল, হুঁশিয়ার, সরে দাঁড়াও, গাছটা পড়ছে?

আমি আর রামহরি একলাফে পাশে সরে দাঁড়ালুম। মড় মড় মড়—মড়াৎ। গাছটা হুড়মুড় করে ভাঙা জায়গাটার দিকে হেলে পড়ল।

বিমল বললে, ব্যাস! দেখ কুমার, আমাদের পোল তৈরী।

গাছটা ঠিক মাঝখানকার ফাঁকটার উপর দিয়ে পাহাড়ের ওপারে গিয়ে পড়েছে, তার গোড়া রইল এদিকে, আগা রইল ওদিকে। যা চেয়েছিলুম তাই...

আহার আর বিশ্রাম সেরে আমরা আবার বৌদ্ধমঠের দিকে অগ্রসর হলুম। রোদ্দুরে পাহাড়ে-পথ তেতে আগুন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু সেসব কষ্ট আমরা আজ গ্রাহের মধ্যেই আনলুম না, মনে মনে দৃঢ়পণ করলুম যে, আজ মঠে না গিয়ে কিছুতেই আর জিরোন নেই।

সূর্য অস্ত যায় যায়। মঠও আর দূরে নেই। তার মেঘ-ছোয়া মন্দিরটার ভাঙা চুড়া আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে। এদিকে-ওদিকে আরো কতকগুলো ছোট ছোট ভগ্নস্তূপও দূর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।

আরো খানিক এগিয়ে দেখলুম, আমাদের দু-পাশে কারুকার্য করা অনেক গুহা রয়েছে। এইসব গুহায় আগে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীরা বাস করতেন, এখন কিন্তু তাদের ভিতর জনপ্রাণীর সাড়া নেই।

গুহাগুলোর মাঝখান দিয়ে পথটা হঠাৎ একদিকে বেঁকে গেছে। সেই বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলুম আমাদের সামনেই মঠের সিংহদরজা।

আমরা সকলেই একসঙ্গে প্রচণ্ড উৎসাহে জয়ধ্বনি করে উঠলুম। বাঘা আসল কারণ না বুঝেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল, ঘেউ ঘেউ ঘেউ। অনেকদিন পরে আবার সেই পোড়ো মন্দিরটার চারিদিক সরগরম হয়ে উঠল।

বিমল দু-হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, যকের ধন আজ আমাদের।

আমি বললুম, চল, চল, চল। আগে সেই জায়গাট খুজে বার করি।

সিংহদরজার ভিতর দিয়ে আমরা মন্দিরের আঙিনায় গিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড আঙিন—চারিদিকে চকবন্দী ঘর, কিন্তু এখন আর তাদের কোন শ্রী-ছাদ নেই। বুনো চার-গাছে আর জঙ্গলে পা ফেলে চলা দায়, এখানে-ওখানে ভাঙা পাথর ও নানারকম মূর্তি পড়ে রয়েছে, স্থানে স্থানে জীবজন্তুর রাশি রাশি হাড়ও দেখলুম। বোধ হয় হিংস্র পশুরা এখন সন্ন্যাসীদের ঘরের ভিতর আস্তানা গেড়ে বসেছে, বাইরে থেকে শিকার ধরে এনে এখানে বসে নিশ্চিন্তভাবে পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে নেয়।

আমি বললুম, বিমল, মড়ার মাথাটা এইবার বার কর, সঙ্কেত দেখে পথ ঠিক করতে হবে।

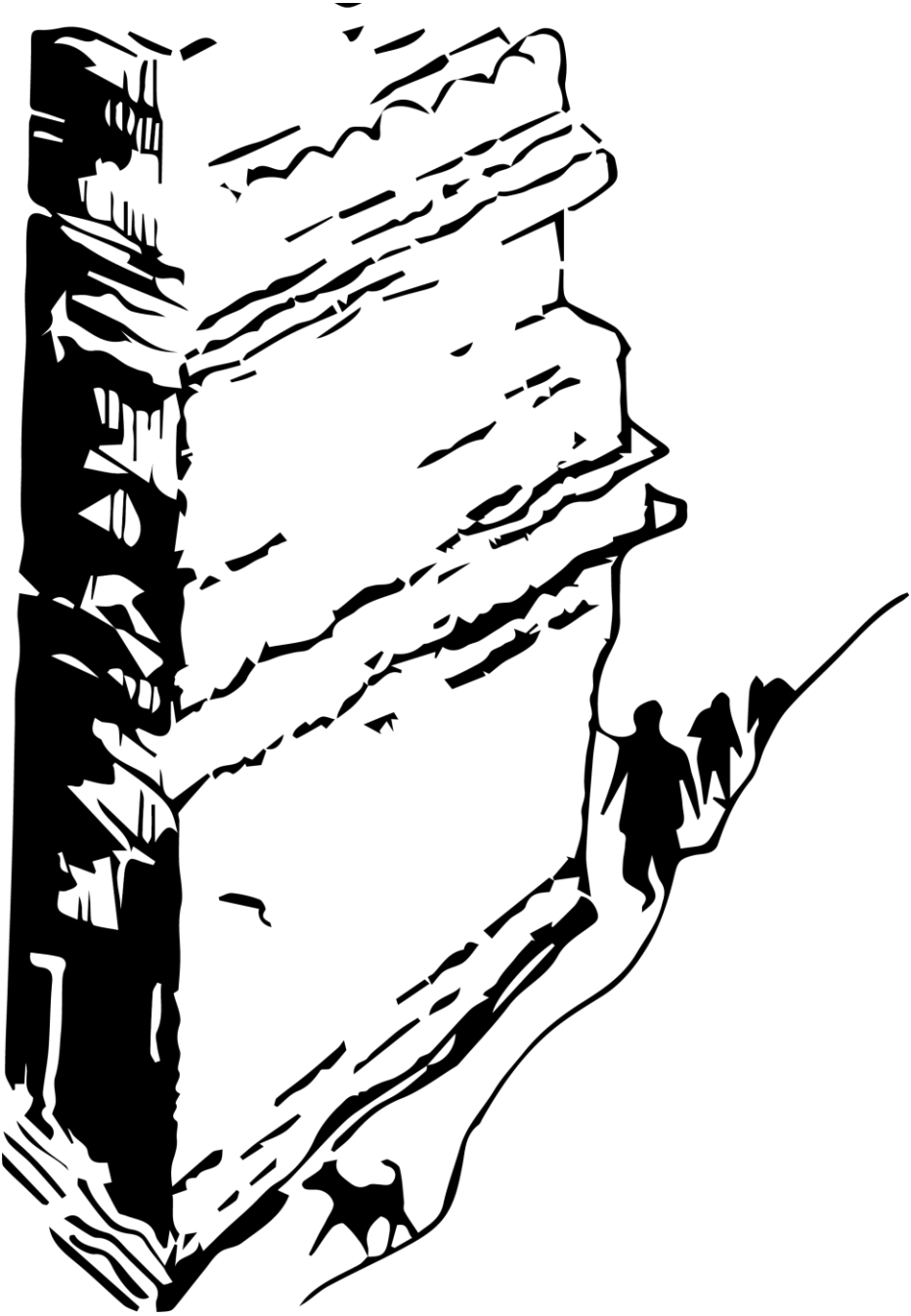

বিমল বললে, তার জন্য ভাবনা কি, সঙ্কেতের কথাগুলো আমার মুখস্থই আছে। এই বলে সে আউড়ে গেল –ভাঙা দেউলের পিছনে সরল গাছ। মূলদেশ থেকে পূর্বদিকে দশ গজ এগিয়ে থামবে। ডাইনে আট গজ এগিয়ে বুদ্ধদেব। বামে ছয় গজ এগিয়ে তিনখানা পাথর। তার তলায় সাত হাত জমি খুড়লে পথ পাবে।

আমি বললুম, তাহলে আগে আমাদের ভাঙা দেউল খুজে বার করতে হবে।

বিমল বললে, খুজতে হবে কেন? দেউল বলতে এখানে নিশ্চয় বোঝাচ্ছে ঐ প্রধান মন্দিরকে। ও মন্দিরটাও তো ভাঙা। আচ্ছা, দেখাই যাক না।

আমরা বড় মন্দিরের পিছনের দিকে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

রামহরি বললে 'বাহঃ, ঠিক কথাই যে! মন্দিরের পিছনে ঐ যে সরল গাছ।

তাই বটে। মন্দিরের পিছনে অনেকটা খোলা জায়গা, আর তার; মধ্যে সরল গাছ আছে মাত্র একটি, কিছু ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।

চারিদিকে মাঝে মাঝে ছোট-বড় অনেকগুলো বুদ্ধদেবের মূর্তি রয়েছে,—কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। ভাঙা, আভাঙা পাথরও পড়ে আছে অগুন্তি।

বিমল বললে, এরি মধ্যে কোন একটি মূর্তির কাছে আমাদের যকের ধন আছে। আচ্ছ, সরল গাছ থেকে পুবদিকে এই দশ গজ এগিয়ে থামলুম। তারপর ডাইনে আট গজ,—হুঁ, এই যে বুদ্ধদেব। বাঁয়ে ছয় গজ –কুমার, দেখ দেখ, ঠিক তিনখানাই পাথর পরে পরে সাজানো রয়েছে। মড়ার মাথার সঙ্কেত তাহলে মিথ্যে নয়। আহ্লাদে বুক আমার দশখানা হয়ে উঠল—মনের আবেগ আর সহ্য করতে না পেরে আমি সেই পাথরগুলোর উপরে ধুপ করে বসে পড়লুম।

বিমল বললে, ওঠ – ওঠ। এখন দেখতে হবে, পাথরের তলায় সত্যি সত্যিই কিছু আছে কি না?

আমরা তিনজনে মিলে তখনি কোমর বেঁধে পাথর সরিয়ে মাটি খুড়তে লেগে গেলুম।

প্রায় হাত-সাতেক খোড়ার পরেই কুড়ুলের মুখে মুখে কি-একটা শক্ত জিনিস ঠক্ ঠক্ করে লাগতে লাগল। মাটি সরিয়ে দেখা গেল, আর একখানা বড় পাথর।

অল্প চেষ্টাতেই পাথরখানা তুলে ফেলা গেল—সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম গর্তের মধ্যে সত্য-সত্যই একটা বাঁধানো সুড়ঙ্গ-পথ রয়েছে।

আমাদের তখনকার মনের ভাব লেখায় খুলে বলা যাবে না। আমরা তিন জনেই আনন্দবিহবল হয়ে পরস্পরের মুখের পানে তাকিয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে বুকটা আমার চমকে উঠল। গর্তের ভেতর থেকে হু হু করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

–বিমল, দেখ–দেখ !

বিমল সবিস্ময়ে গর্তের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, তাই তো, কি কাণ্ড! এতদিনের বন্ধ গর্তের ভেতর থেকে ধোয়া আসছে কেমন করে?

তখন সন্ধ্যা হতে আর বিলম্ব নেই—পাহাড়ের অলিগলি ঝোপঝাপের ধারে ধীরে অন্ধকার জমতে সুরু হয়েছে, চারিদিক এত স্তব্ধ যে পাখিদের সাড়া পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না।

গর্ত থেকে ধোঁয়া তখনও বেরুচ্ছে, আর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে।

বিমল আস্তে আস্তে বললে, সামনেই রাত্রি, আজ আর হাঙ্গামে কাজ নেই। কাল সকালে সব ব্যাপার বোঝা যাবে। এস, গর্তের মুখে আবার পাথর চাপিয়ে রাখা যাক।

মরণের হাসি

মনটা কেমন দমে গেল। অতগুলো পাথর-চাপানো বন্ধ গর্ভের মধ্যে ধোয় এল কেমন করে? আগুন না থাকলে ধোয়া হয় না, কিন্তু গর্তের ভিতর আগুনই বা কোথেকে আসবে? আগুন তো জ্বালে মানুষেরই হাত! অনেক ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলুম না।

সে রাত্রে মঠের একটা ঘরের ভিতরে আমরা আশ্রয় নিলুম। খাওয়া-দাওয়ার পর শোবার আগে বিমলকে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, হ্যাঁ, হে, তুমি যকের কথায় বিশ্বাস কর?

বিমল বললে, 'হ্যাঁ, শুনেছি যক একরকম প্রেতযোনি। তারা গুপ্তধন রক্ষা করে। কিন্তু যক আমি কখনো চোখে দেখিনি, কাজেই তার কথা আমি বিশ্বাসও করি না।

আমি বললুম, তুমি ভগবানকে কখনো চোখে দেখনি, তবু ভগবানকে যখন বিশ্বাস কর, তখন যকের কথাতেও বিশ্বাস কর না কেন?

বিমল বললে, হঠাৎ যকের কথা তোলবার কারণ কি কুমার?

—কারণ আমার বিশ্বাস ঐ গুপ্তধনের গর্তের ভেতরে ভুতুড়ে কিছু আছে। নইলে—

—নইলে-টইলের কথা যেতে দাও। ভূত-দানব যাই-ই থাক, কাল আমি গর্তের মধ্যে ঢুকবই—দৃঢ়স্বরে এই কথাগুলো বলেই বিমল শুয়ে পড়ে কম্বল মুড়ি দিলে।

আমার বুকের ছমছমানি কিন্তু গেল না। রামহরির কাছ ঘেঁসে বসে বললুম, আচ্ছা রামহরি, তুমি যক বিশ্বাস কর?

—করি ছোটবাবু।

—তোমার কি মনে হয় না রামহরি, ঐ গর্তের ভেতরে যক আছে?

—যকই থাকুক আর রাক্ষসই থাকুক, খোকাবাবু যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব—এই বলে রামহরিও লম্ব হয়ে শুয়ে পড়ল।

যেমন মনিব, তেমনি চাকর। দুটিতে সমান গোঁয়ার। আমি নাচার হয়ে বসে বসে পাহারা দিতে লাগলুম।.

ভোরবেলায় উঠেই আমরা আবার যথাস্থানে গিয়ে হাজির। গর্তের মুখ থেকে পাথরগুলো আবার সরিয়ে ফেলা-হল। খানিকক্ষণ অপেক্ষ করেও আজ কিন্তু ধোঁয় দেখতে পাওয়া গেল না।

বিমল আশ্বস্ত হয়ে বললে, বোধ হয় অনেককাল বন্ধ থাকার দরুণ গর্তের ভেতরে বাষ্প-টাষ্প কিছু জমেছিল, তাকেই আমরা ধোয় বলে ভ্রম করেছিলুম?

বিমলের এই অনুমানে আমারও মন সায় দিলে। নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, এখন আমাদের কি করা উচিত?

বিমল বললে,'সুড়ঙ্গের ভেতরে যাব, তারপর ধন খুজে বার করব ...কুমার, রামহরি, তোমরা প্রত্যেকে এক-একটা "ইলেকটিক টর্চ" নাও, কারণ মুড়ঙ্গের ভেতরটা নিশ্চয়ই অমাবস্যার রাতের মত অন্ধকার। এই বলে সে প্রথমে বাঘাকে গর্তের মধ্যে নামিয়ে দিলে, তারপর নিজেও নেমে পড়ল। আমরাও দুজনে তার অনুসরণ করলুম।

উঃ, সুড়ঙ্গের ভিতরে সত্যিই কি বিষম অন্ধকার, দু-চার পা এগিয়ে আমর ভুলে গেলুম যে, বাইরে এখন সূর্যদেবের রাজ্য। ভাগ্যে এই 'বিজলী-মশাল' বা ইলেকটিক টর্চগুলো আমাদের সঙ্গে ছিল, নইলে ভয়ে এক পাও অগ্রসর হতে পারতুন না।

আমরা হেঁট হয়ে ক্রমেই ভিতরে প্রবেশ করেছি, কারণ সুড়ঙ্গের ছাদ এত নীচু যে, মাথা তোলবার কোন উপায় নেই।

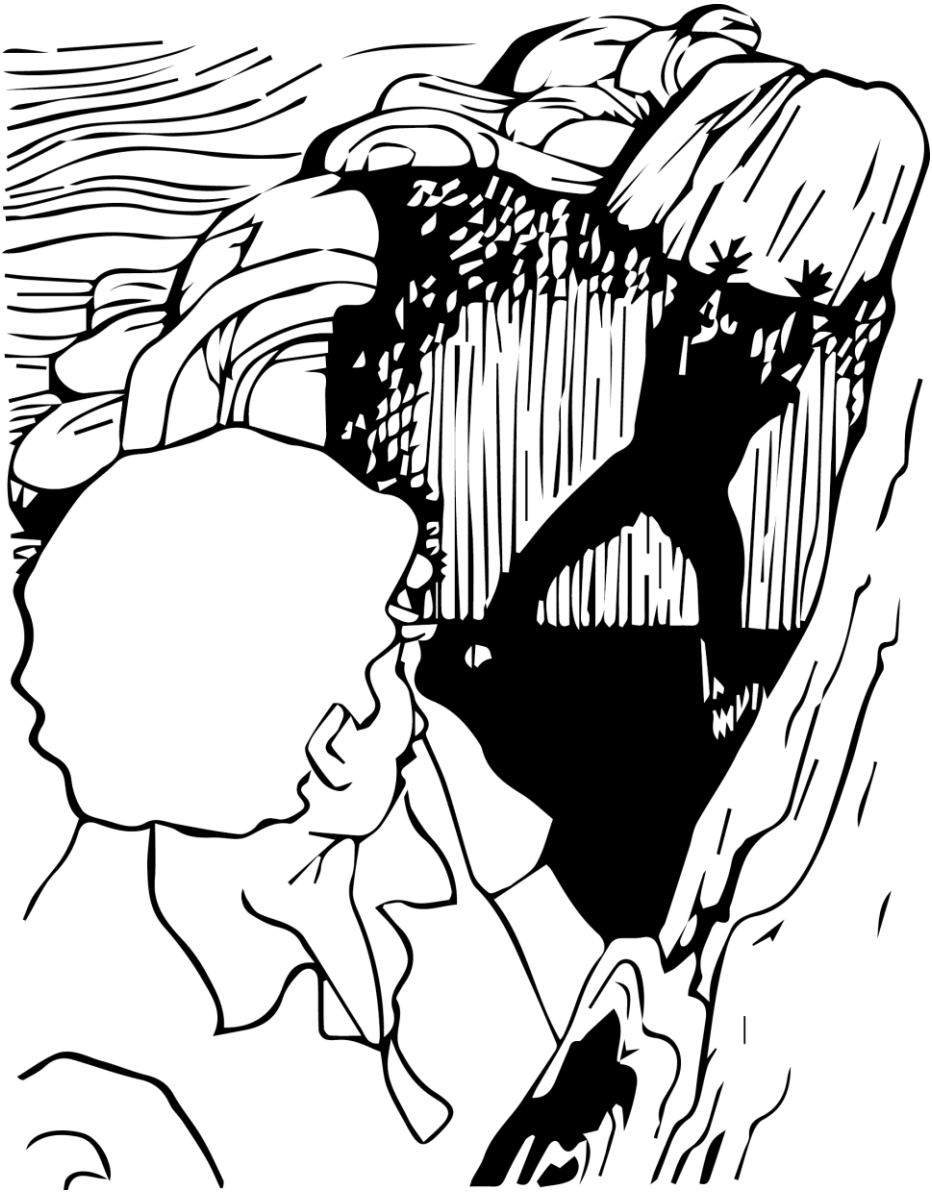

আচম্বিতে পিছনে কিসের একটা শব্দ হল—সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পিছনে ফিরে দেখলুম, সুড়ঙ্গের মুখের গর্ত দিয়ে বাইরের যে আলোটুকু আসছিল, তা আর দেখা যাচ্ছে না।

আবার সেইরকম একটা শব্দ। তারপর আবার,—আবার। আমি তাড়াতাড়ি ফের সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এলুম। যা দেখলুম, তাতে প্রাণ আমার উড়ে গেল!

সুড়ঙ্গের মুখ একেবারে বন্ধ! বিমলও এসে ব্যাপারটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ, সকলের আগে কথা কইলে রামহরি। সে বললে, কে এ কাজ করলে?

বিমল পাগলের মতন গর্তের মুখে ঠেলা মারতে লাগল, কিন্তু তার অসাধারণ শক্তিও আজ হার মানলে—গর্তের মুখ একটুও খুলল না।

আমি হতাশভাবে বললুম, বিমল, আর প্রাণের আশা ছেড়ে দাও, এইখানেই জ্যান্ত আমাদের কবর হবে।

আমরা কথা শেষ হতে না হতেই কাশির মত খনখনে গলায় হঠাৎ খিলখিল করে কে হেসে উঠল। সে কি ভীষণ বিশ্রী হাসি, আমার বুকের ভিতরটা যেন মড়ার মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

হাসির আওয়াজ এল সুড়ঙ্গের ভিতর থেকেই। তিনজনেই বিজুলী-মশাল তুলে ধরলুম, কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলুম না।

বিমল বললে,'কে হাসলে কুমার?

আমি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপপতে বললুম, যক, যক!

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই খিলখিল করে খনখনে হাসি। মানুষে কখনও তেমন হাসি হাসতে পারে না। বাঘা পর্যন্ত অবাক হয়ে কান খাঁড়া করে সুড়ঙ্গের ভিতরের দিকে চেয়ে রইল।

পাছে আবার সেই হাসি শুনতে হয়, তাই আমি দুই হাতে সজোরে দুই কান বন্ধ করে মাটির উপর বসে পড়লুম।

ধনাগার

জীবনে এমন বুক-দমানে হাসি শুনিনি,—সে হাসি শুনলে কবরের ভিতরে মড়াও যেন চমকে জেগে শিউরে ওঠে।

হাসির তরঙ্গে সমস্ত সুড়ঙ্গ কাঁপতে লাগল।

আমার মনে হল বহুকাল পরে সুড়ঙ্গের মধ্যে মানুষের গন্ধ পেয়ে যক আজ প্রাণের আনন্দে হাসতে সুরু করেছে – কতকাল অনাহারের পর আজ তার হাতের কাছে খোরাক গিয়ে আপনি উপস্থিত!

উপরে গর্তের মুখ বন্ধ—ভিতরে এই কাণ্ড! এ জীবনে আর যে কখনো চন্দ্র-সূর্যের মুখ দেখতে পাব না, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই! হাসির আওয়াজ ক্রমে দূরে গিয়ে ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল— কেবল তার প্রতিধ্বনিটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গম গম করতে লাগল।

আর কোন বাঙালীর ছেলে নিশ্চয়ই আমাদের মতন অবস্থায় কখনো পড়েনি! আমরা যে এখনো পাগল হয়ে যাইনি, এইটেই আশ্চর্য!

তিনজনে স্তম্ভিতের মত বসে বসে পরস্পরের.মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম –কারুর মুখে আর বাক্য সরছে না।

বিমলের মুখে আজ প্রথম এই দুর্ভাবনার ছাপ দেখলুম। সে ভয় পেয়েছে কিনা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু আমার মনে হল আজ সে বিলক্ষণ দমে গিয়েছে।...আর না দমে করে কি, এতেও যে দমবে না, নিশ্চয়ই সে মানুষ নয়!

প্রথম কথা কইলে রামহরি। আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে বললে, বাবু, আর এ রকম করে বসে থাকলে কি হবে, একটা ব্যবস্থা করতে হবে তো?

আমি বললুম, ব্যবস্থা আর করব ছাই। যতক্ষণ প্রাণটা আছে, নাচার হয়ে নিঃশ্বাস ফেলি এস?

বিমল বললে, কিন্তু গর্তের মুখ বন্ধ করলে কে?

আমি বললুম, যক।

বিমল মুখ ভেঙিয়ে বললে, যকের নিকুচি করেছে। আমি ওসব মানি না?

—না মেনে উপায় কি? ভেবে দেখ বিমল, যে গর্তের কথা কাকপক্ষী জানে না, সেই গর্তেরই মুখ হঠাৎ এমন বন্ধ হয়ে গেল কি করে?

বিমল চিন্তিতের মতন বললে, হ্যাঁ, সেও একটা কথা বটে।

—মনে আছে তো, কাল এই গর্তের ভিতর থেকে হু-হু করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল?

—মনে আছে।

—আর এই বিশ্রী হাসি।

বিমল একেবারে চুপ।

হঠাৎ রামহরি চেঁচিয়ে উঠল—খোকাবাবু, দেখ—দেখ?

ও কী ব্যাপার। আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখলুম, খানিক তফাতে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে সে করে একটা আগুন চলে গেল।

আমি সরে এসে পাথর-চাপা গর্তের মুখে পাগলের মতন ধাক্কা মারতে লাগলুম–কিন্তু গর্তের মুখ একটুও খুলল না।

বিমল বললে, কুমার। বিজলী-মশালটা জ্বেলে আমার সঙ্গে এস। রামহরি, তুমি সকলের পিছনে থাক। আমি দেখতে চাই, ও আগুনটা কিসের!

আগুনটা তখন আর দেখা যাচ্ছিল না। বিমল বন্দুক বাগিয়ে ধরে এগিয়ে গেল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম। ভয়ে আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

খানিক দূরে গিয়েই সুড়ঙ্গটা আর একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে পড়েছে—সেইখানেই আগুনটা জ্বলে উঠেছিল।

সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা সতর্কভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

হাতকয়েক দূরে, মাটির উপরে কি যেন একটা পড়ে রয়েছে বলে মনে হল-বাঘা ছুটে সেইখানে চলে গেল।

বিজলী-মশালের আলোটা ভালো করে তার উপরে গিয়ে পড়তেই, বিমল বলে উঠল, ও যে দেখছি একটা মানুষের দেহের মত?

রামহরি বললে, কিন্তু একটুও নড়চে না কেন?

হঠাৎ আবার কে হেসে উঠল—হি-হি-হি-হি ! কোথা থেকে কে যে সেই ভয়ানক হাসি হাসলে, আমরা কেউ তা দেখতে পেলুম না। সকলেই আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম-হাসির চোটে সমস্ত সুড়ঙ্গট আবার থর থর করে কাঁপতে লাগল!

আমি আঁতকে চেঁচিয়ে বললুম, পালিয়ে এস বিমল, পালিয়ে এস —চল আমরা গর্তের মুখে ফিরে যাই।

কিন্তু বিমল আমার কথায় কান পাতলে না—সে সামনের দিকে ছুটে এগিয়ে গেল।

সুড়ঙ্গ আবার স্তব্ধ। বিমল একেবারে সেই মানুষের দেহটার কাছে গিয়ে দাড়াল, তারপর হেঁট হয়ে তার গায়ে হাত দিয়েই বলে উঠল, কুমার, এ যে একটা মড়া!

সুড়ঙ্গের মধ্যে মানুষের মৃতদেহ। আশ্চর্য!

বিমল আবার বললে, কুমার, এদিকে এসে এর মুখের ওপরে ভালো করে আলোটা ধর তো!

আর এগুতে আমার মন চাইছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে বিমলের কাছে যেতে হল।

আলোটা ভালো করে ধরতেই বিমল উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল— কুমার, কুমার, এ যে শম্ভু!

তাইতো, শম্ভুই তো বটে। চিং হয়ে তার দেহটা পড়ে রয়েছে, চোখ দুটো ভিতর থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, আর তার গলার কাছটায় প্রকাণ্ড একটা ক্ষত।

বিমল হেঁট হয়ে শম্ভুর গায়ে হাত দিয়ে বললে, 'না, কোন আশা নেই— অনেকক্ষণ মরে গেছে।

আমি সেই ভয়ানক দৃশ্যের উপর থেকে আলোট সরিয়ে নিয়ে বললুম, কিন্তু-কিন্তু-শম্ভু এখানে এল কেমন করে?

বিমল চমকে উঠে বললে, তইতো, ও কথাটা তো এতক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি-শম্ভু এই সুড়ঙ্গের সন্ধান পেল কোত্থেকে? আমি বললুম, শম্ভু যখন এসেছে, তখন করালীও নিশ্চয় সুড়ঙ্গের কথা জানে।

বিমল একলাফ মেরে বলে উঠল—কুমার, কুমার। আলোটা ভালো করে ধর —যকের ধন! যকের ধন কোথায় আছে, আগে তাই খুজে বার করতে হবে।

চারিদিকে আলোটা বারকতক ঘোরাতে-ফেরাতেই দেখা গেল, সুড়ঙ্গের এককোণে একটা দরজা রয়েছে।

বিমল ছুটে গিয়ে দরজাটা ঠেলে বললে, এই যে একটা ঘর! যকের ধন নিশ্চয়ই এর ভেতরে আছে।

অদৃশ্য বিপদ

ঘরের ভিতর ঢুকে আমরা সাগ্রহে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

ঘরটা ছোট—ধুলো আর দুর্গন্ধে ভরা। আসবাবের মধ্যে রয়েছে খালি এককোণে একট পাথরের সিন্দুক—এ রকম সিন্দুক কলকাতার যাদুঘরে আমি একবার দেখেছিলুম।

বিমল এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ডালাটা তখনই খুলে ফেললে, আমরা সকলেই একসঙ্গে তার ভিতরে তাড়াতাড়ি হুমড়ি খেয়ে উঁকি মেরে দেখলুম-কিন্তু হা ভগবান, সিন্দুক একেবারে খালি।

আমাদের এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত আয়োজন –সমস্তই ব্যর্থ হল।

কেউ আর কোন কথা কইতে পারলুম না, আমার তো ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল।

অনেকক্ষণ পরে বিমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে,"আমাদের একূল-ওকুল হুকুল গেল! যকের ধনও পেলুম না, প্রাণেও বোধহয় বাঁচব না!

আমি বললুম, বিমল, আগে যদি আমার মানা শুনতে। কতবার তোমাকে বলেছি ফিরে চল, যকের ধনে আর কাজ নেই।

রামহরি বললে, 'আগে থাকতেই মুষড়ে পড়ছ কেন? খুঁজে দেখ, হয়তো আর কোথাও যকের ধন লুকানো আছে?

বিমল বললে, আর খোজাখুঁজি মিছে। দেখছ না, আমাদের আগেই এখানে অন্য লোক এসেছে, সে কি আর শুধু-হাতে ফিরে গেছে?

আমি বললুম, এ কাজ করালী ছাড়া আর কারুর নয়।

—হুঁ।

—"কিন্তু সে কি করে খোঁজ পেলে?

—খুব সহজেই। কুমার, আমরা বোকা-গাধার চেয়েও বোকা। করালী পালিয়েছে ভেবে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে পথ চলছিলুম—সে কিন্তু নিশ্চয়ই লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পিছু নিয়েছিল। তারপর কাল যখন আমরা সুড়ঙ্গের মুখ খুলেছিলুম, সে তখন কাছেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে বসেছিল। কাল রাতেই সে কাজ হাসিল করেছে, আমরা যে কোনরকমে পিছু নিয়ে তাকে আবার ধরব, সে উপায়ও আর রেখে যায়নি। বুঝেছ কুমার, করালী গর্তের মুখ বন্ধ করে দিয়ে গেছে।

—কিন্তু শম্ভুকে খুন করলে কে?

—করালী নিজেই।

—কেন সে তা করবে?

—পাছে যকের ধনে শম্ভু ভাগ বসাতে চায়।

হঠাৎ আমাদের কানের উপরে আবার সেই ভীষণ অট্টহাসি বেজে উঠল—'হা-হা-হা-হা-হা''

আমি আর্তনাদ করে বলে উঠলুম, বিমল, শম্ভুকে খুন করেছে এই যক?

আবার-আবার সেই হাসি!

আমার হাত থেকে বিজলী-মশালটা কেড়ে নিয়ে বিমল-যেদিক থেকে হাসি আসছিল, সেইদিকে ঝড়ের মতন ছুটে গেল—তার পিছনে ছুটল রামহরি।

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে একল বসে আমি ভয়ে কাঁপতে লাগলুম—বিমল এত তাড়াতাড়ি চলে গেল যে, আমিও তার পিছু নিতে পারলুম না।

উঃ, পৃথিবীর বুকের মধ্যেকার সে অন্ধকার যে কি জমাট, লেখায় তা প্রকাশ করা যায় না—অন্ধকারের চাপে আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল।

হঠাৎ আমার পিঠের উপরে ফোঁস করে কে নিঃশ্বাস ফেললে। চেঁচিয়ে বিমলকে ডাকতে গেলুম, কিন্তু গলা দিয়ে আমার আওয়াজই বেরুল না। সামনের

দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু ঘরের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটির উপরে পড়ে গেলুম।

উঠে বসতে না বসতেই আমার পিঠের উপরে কে লাফিয়ে পড়ল এবং লোহার মতন শক্ত দুখান হাত আমাকে জড়িয়ে ধরলে।

আমি তার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলুম—সে কিন্তু অনায়াসে আমাকে শিশুর মত ধরে ঘরের মেঝের উপর চিৎ করে ফেললে— প্রাণপণে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম–বিমল, বিমল, বিমল, বাঁচাও— আমাকে বাচাও?

আমার বুকের উপরে বসে সে হা-হা করে হাসতে লাগল – কিন্তু তার পরমুহূর্তেই সে হাসি আচম্বিতে বিকট এক আর্তনাদের মতন বেজে উঠল—সঙ্গে

সঙ্গে আমার বুকের উপর থেকে সেই ভূত না মানুষটা—ভগবান জানেন কি—মাটির উপর ছিটকে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আমি উঠে বসলুম—অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু শব্দ শুনে যেন বুঝলুম, ঘরের ভিতরে বিষম এক ঝটাপটি চলেছে।

ভূত, না জন্তু, না মানুষ?

কি যে করব, কিছুই বুঝতে না পেরে, দেওয়ালে পিঠ রেখে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম-ওদিকে ঘরের ভিতরে ঝাপটা-ঝাপটি সমানে চলতে লাগল।

তারপরেই সব চুপচাপ।

আলো নিয়ে বিমল তখনে ফিরল না, অন্ধকারে আমিও আর উঠতে ভরসা করলুম না। ঘরের ভিতরে যে খুব একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সে কাণ্ডটা যে কি, অনেক ভেবেও আমি তা ঠাউরে উঠতে পারলুম না।

হঠাৎ আমার গায়ের উপরে কে আবার ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলে। আঁতকে উঠে একলাফে আমি পাঁচ হাত পিছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রাণপণে সামনের দিকে চেয়ে দেখলুম, অন্ধকারের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত চোখ যেন আমার পানে তাকিয়ে আছে । খানিক পরেই চোখ দুটো ধীরে ধীরে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল!

এবারে প্রাণের আশা একেবারেই ছেড়ে দিলুম। পায়ে পায়ে আমি পিছনে হটতে লাগলুম—সেই জ্বলন্ত চোখ দুটোর উপরে স্থির দৃষ্টি রেখে । হঠাৎ কি একট। জিনিসে পা লেগে আমি দড়াম করে পড়ে গেলুম এবং প্রাণের ভয়ে যত-

জোরে-পারি চেঁচিয়ে উঠলুম. তারপরেই কিন্তু বেশ বুঝতে পারলুম-আমি একটা মানুষের দেহের উপর কাৎ হয়ে পড়ে আছি !

সে দেহ কার, তা জীবিত না মৃত, এসব ভাববার কোন সময় নেই—কারণ গেলবারের মতন এবারেও হয়তো আবার কোন শয়তান আমার পিঠের উপরে লাফিয়ে পড়বে—সেই ভয়েই কাতর হয়ে তাড়াতাড়ি চোখ তুলতেই দেখি, সুড়ঙ্গের মধ্যে বিজলী-মশালের আলো দেখা যাচ্ছে। আঃ, এতক্ষণ পরে!

আলো দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল, তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠলুম–বিমল, বিমল, শীগগির এস!

—কি হয়েছে কুমার-ব্যাপার কি? বলতে বলতে বিমল ঝড়ের মতন ছুটে এল—তার পিছনে রামহরি।

বিজলী-মশালের আলো ঘরের ভিতরে পড়তেই দেখলুম, ঠিক আমার সামনে, মাটির উপরে দুই থাবা পেতে বসে বাঘা জিভ বার করে অত্যন্ত হাঁপাচ্ছে। তার মুখে ও সর্বাঙ্গে টাটকা রক্তের দাগ।

বুঝলুম, এই বাঘার চোখ দুটো দেখেই এবারে আমি মিছে ভয় পেয়েছি। কিন্তু তার মুখে আর গায়ে এত রক্ত কেন?

হঠাৎ বিমল বিস্ময়ের স্বরে বললে, কুমার, কুমার, তুমি কিসের উপরে বসে আছ?

তখন আমার হুস হল – আমার তলায় যে একটা মানুষের দেহ।

একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে যা দেখলুম, তা আর জীবনে কখনো ভুলব না !

ঘরের মেঝের উপর মস্ত লম্বা একটা কালো কুচকুচে মানুষের প্রায় উলঙ্গ দেহ চিৎ হয়ে সটান পড়ে আছে। লম্বা লম্বা জটপাকানো চুল আর গোঁফদাড়িতে তার মুখখানা প্রায় ঢাকা পড়েছে—তার চোখ দুটো ড্যাব-ডেবে, দেখলেই বুক চমকে ওঠে, হাঁ-করা মুখের ভিতর থেকে বড় বড় হিংস্র দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে—কে এ?...সেই অদ্ভুত মূর্তি দেখে সহজে বোঝা শক্ত যে, সে ভূত, না জন্তু, না

মানুষ। বিমল হেঁট হয়ে দেখে বললে, 'এর গলা দিয়ে যে হু-হু করে রক্ত বেরুচ্ছে।

আমি শুদ্ধস্বরে বললুম, বিমল, একটু আগে এই লোকটা আমাকে খুন করবার চেষ্টা করেছিল।

—বল কি, তারপর—তারপর?

—তারপর ঠিক কি যে হল অন্ধকারে আমি তা বুঝতে পারিনি বটে, কিন্তু বোধহয় বাঘার জন্যই এ-যাত্রা আমি বেঁচে গেছি?

—বাঘার জন্যে!

—হ্যাঁ, সে-ই টুটি কামড়ে ধরে একে আমার বুকের উপর থেকে টেনে নামায়, বাঘার কামড়েই যে ওর এই দশা হয়েছে, এখন আমি বেশ বুঝতে পারছি। দেখ দেখি, ও বেঁচে আছে কিনা?

বিমল পরীক্ষা করে দেখে বললে, না, একেবারে মরে গেছে।

রামহরি বাঘার পিঠ চাপড়ে বললে, 'সাবাস বাঘ, সাবাস বাঘা, সাবাস।

বাঘ আহ্লাদে ল্যাজ নাড়তে লাগল; আমি আদর করে তাকে বুকে টেনে নিলুম।

বিমল বললে,"কিন্তু এ লোকটা কে?

রামহরি বললে, 'উঁঃ, কি ভয়ানক চেহারা। দেখলেই ভয় হয়।

আমি বললুম, আমার তো ওকে পাগল বলে মনে হচ্ছে।'

বিমল বললে, হতে পারে। নইলে অকারণে তোমাকে মারবার চেষ্টা করবে কেন?

আমি বললুম, এতক্ষণে আর একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি। শম্ভু বোধহয় এর হাতেই মারা পড়েছে।

রামহরি বললে, কিন্তু এ সুড়ঙ্গের মধ্যে এল কি করে?

বিমল চুপ করে ভাবতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে সে বললে, দেখ কুমার, হাসি শুনে কে হাসছে খুঁজতে গিয়ে আমরা মুড়ঙ্গের এক জায়গায় কতকগুলো জ্বলন্ত কাঠ আর পোড়া মাংস দেখে এসেছি। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এ লোকটাই এই সুড়ঙ্গের মধ্যে বাস করত। আমাদের দেখে এ-ই এতক্ষণ হাসছিল—এ যে পাগল তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

আমি বললুম, কিন্তু সুড়ঙ্গের চারিদিক যে বন্ধ?

বিমল লাফ মেরে দাঁড়িয়ে আনন্দভরে বলে উঠল, কুমার, আমরা বেঁচে গেছি। এই অন্ধকূপের মধ্যে আমাদের আর অনাহারে মরতে হবে না।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, হঠাৎ তোমার এতটা আহ্লাদের কারণ কি?

বিমল বললে, কুমার, তুমি একটি নিরেট বোকা। এও বুঝছ না যে, এই পাগলাট যখন সুড়ঙ্গের মধ্যে বাসা বেঁধেছে, তখন কোথাও বাইরে যাবার একটা পথও আছে। সুড়ঙ্গের যে মুখ দিয়ে ঢুকেছি, সে মুখ তো বরাবরই বন্ধ ছিল, সুতরাং সেখান দিয়ে নিশ্চয়ই পাগলাটা আনাগোনা করত না। যদি বল সে বাইরে যেত না, তাহলে সুড়ঙ্গের মধ্যে জ্বালানি কাঠ আর মাংস এলো কোত্থেকে?

আমি বললুম, কিন্তু অন্য পথ থাকলেও আমরা তো তার সন্ধান জানি না।

বিমল বললে, সেইটেই আমাদের খুজে দেখা দরকার। মুড়ঙ্গের সবটা তো আমরা দেখিনি।

আমি বললুম, তবে চল, আগে পথ খুঁজে বার করতে হবে। যকের ধন তো পেলুম না, এখন কোনগতিকে বাইরে বেরুতে পারলেই বাঁচি?

বিমল বললে, যকের ধন এখনো আমাদের হাতছাড়া হয়নি। পথ যদি খুঁজে পাই, তাহলে এখনো করালীকে ধরতে পারব। এখানে আর দেরি করা নয়,-চলে এস।

বিমল আরো এগিয়ে গেল, আমরা তার পিছনে পিছনে চললুম। সুড়ঙ্গটা যে কত বড়, তার মধ্যে যে এত অলিগলি আছে, আগে আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে আমরা চারিদিকে আতিপাতি করে খুঁজে বেড়ালুম, কিন্তু পথ তবু পাওয়া গেল না। সেই চির-অন্ধকারের রাজ্যে আলো আর বাতাসের অভাবে প্রাণ আমাদের থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠছিল, কিন্তু উপায় নেই, কোন উপায় নেই! শেষটা হাল ছেড়ে দিয়ে আমি বললুম, বিমল, আর আমি ভাই পারছি না, পথ যখন পাওয়াই যাবে না, তখন এখানেই শুয়ে শুয়ে আমি শান্তিতে মরতে চাই। এই বলে আমি বসে পড়লুম।

বিমল আমার হাত ধরে নরম গলায় বললে, ভাই কুমার, এত সহজে কাবু হয়ে পড়লে চলবে না। পথ আছেই, আমরা খুঁজে বার করবই?

আমি সুড়ঙ্গের গায়ে হেলান দিয়ে বললুম, তোমার শক্তি থাকে তো পথ খুজে বার কর—আমার শরীর আর বইছে না?

হঠাৎ বাঘা দাঁড়িয়ে উঠে কান খাড়া করে একদিকে চেয়ে রইল— বিমলও আলোটা তাড়াতাড়ি সেইদিকে ফেরালে। দেখলুম— খানিক তফাতে একটা শেয়াল থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে।

বাঘা তাকে রেগে ধমক দিয়ে তেড়ে গেল, শেয়ালটা তো ভয় পেয়ে ছুট দিলে— ব্যাপারটা কি হয় দেখবার জন্যে বিমল বিজলী-মশালের আলোটা সেইদিকে ঘুরিয়ে ধরলে।

অল্পদুরে গিয়েই শেয়ালটা সুড়ঙ্গের উপরদিকে একটা লাফ মেরে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঘা হতভম্বর মত সেইখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

শেয়ালটা কি করে পালাল দেখবার জন্যে বিমল কৌতুহলী হয়ে এগিয়ে গেল। তারপর আলোটা মাথার উপর তুলে ধরে সেখানটা দেখেই মহা আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল, পথ পেয়েছি কুমার, পথ পেয়েছি!

বিমলের কথায় আমার দেহে যেন নূতন জীবন ফিরে এল, তাড়াতাড়ি উঠে সেইখানে ছুটে গিয়ে বললুম কৈ, কৈ?

—এই যে।

দেয়ালের একেবারে উপরদিকে ছোট একটা গর্তের মত, তার ভিতর দিয়ে বাইরের আলো রূপোর আভার মত দেখাচ্ছে। এতক্ষণ পরে পৃথিবীর আলো দেখে আমার চোখ আর মন যেন জুড়িয়ে গেল। বিমল বললে, 'নিশ্চয় পাহাড় ধ্বসে এই পথের সৃষ্টি হয়েছে। কুমার, তুমি সকলের আগে বেরিয়ে যাও। রামহরি, তুমি আলোটা নাও, আমি কুমারকে গর্তের মুখে তুলে ধরি।

বিমল আমাকে কোলে করে তুলে ধরলে, গর্ত দিয়ে মুখ বাড়াতেই নীলাকাশের সূর্য, স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস আর ফলে-ফুলে ভরা সবুজ বন যেন আমাকে অভ্যর্থনা করলে চিরজন্মের মতন সাদরে!

করালীর আর এক কীর্তি

বাইরের আলো-হাওয়া যে কত মিষ্টি, পাতালের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে সেদিন তা ভালো করে প্রথম বুঝতে পারলুম। কারুর মুখে কোন কথা নেই –সকলে মিলে নীরবে বসে খানিকক্ষণ ধরে সেই আলো-হাওয়াকে প্রাণভরে ভোগ করে নিতে লাগলুম।

হঠাৎ বিমল একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আলো-হাওয়া আজও আছে, কালও থাকবে। কিন্তু করালীকে আজ না ধরতে পারলে এ-জীবনে আর কখনো ধরতে পারব না। ওঠ কুমার, ওঠ রামহরি।

আমি কাতরভাবে বললুম, কোথায় যাব আবার?

যে পথে এসেছি, সেই পথে। করালীকে ধরব—যকের ধন কেড়ে নেব।

—কিন্তু এখনে যে আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়নি।

বিমল হাত ধরে একটানে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, খাওয়া-দাওয়ার নিকুচি করেছে। আগে তো বেরিয়ে পড়ি, তারপর ব্যাগের ভেতরে বিস্কুটের টিন আছে, পথ চলতে চলতে তাই খেয়েই পেট ভরাতে পারব।—এস, এস, আর দেরি নয়।

বন্দুকটা ঘাড়ে করে বিমল অগ্রসর হল, আমরাও তার পিছনে পিছনে চললুম।

বিমল বললে, সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়ে করালী নিশ্চয় ভাবছে, আর কেউ তার যকের ধনে ভাগ বসাতে আসবে না। সে নিশ্চিন্ত মনে দেশের দিকে ফিরে চলেছে, আমরা একটু তাড়াতাড়ি হাঁটলে আজকেই হয়তো আবার তাকে ধরতে পারব, এরি মধ্যে সে বেশীদূর এগুতে পারেনি।

আমি বললুম, কিন্তু করালী তো সহজে যকের ধন ছেড়ে দেবে না।

—তা তো দেবেই না।

—তাহলে আবার একটা মারামারি হবে বল?

—হবে বৈকি! কিন্তু এবারে আমরাই তাকে আগে আক্রমণ করব।

এমনি কথা কইতে কইতে, বৌদ্ধমঠ পিছনে ফেলে আমরা অনেকদূর এগিয়ে পড়লুম।

ক্রমে সূর্য ডুবে গেল, চারিধারে অন্ধকারের আবছায়া ঘনিয়ে এল, বাসামুখে পাখির কলরব করতে করতে জানিয়ে দিয়ে গেল যে, পৃথিবীতে এবার ঘুমপাড়ানি মাসির রাজত্ব শুরু হবে।

আমরা পাহাড়ের সেই মস্ত ফাটলের কাছে এসে পড়লুম,—সরল গাছ কেটে সাঁকোর মতন করে যেখানটা আমাদের পার হতে হয়েছিল।

সাঁকোর কাছে এসে বিমল বললে,"দেখ কুমার, আমি যদি করালী হতুম, তাহলে কি করতুম জানো?

—কি করতে?

—এই গাছটাকে যে-কোন রকমে ফাটলের মধ্যে ফেলে দিয়ে যেতুম। তাহলে আর কেউ আমার পিছু নিতে পারত না?

—কিন্তু করালী যে জানে তার শত্রুরা এখন কবরের অন্ধকারে হাঁপিয়ে মরছে, তারা আর কিছুই করতে পারবে না।

—এত বেশী নিশ্চিন্ত হওয়াই ভুল, সাবধানের মার নেই। দেখ না, এক এই ভুলেই করালীকে যকের ধন হারাতে হবে ...কিন্তু কে ও—কে ও?

আমরা সকলেই স্পষ্ট শুনলুম, স্তব্ধ সন্ধ্যার বুকের মধ্য থেকে এক ক্ষীণ আর্তনাদ জেগে উঠছে—জল, একটু জল।

—কুমাল, কুমার, ও কার আর্তনাদ?

—একটু জল, একটু জল।

সকলে মিলে এদিকে-ওদিকে খুঁজতে খুঁজতে শেষটা দেখলুম, পাহাড়ের একপাশে একটা খাদলের মধ্যে যেন মানুষের দেহের মত কি পড়ে রয়েছে। জঙ্গলে সেখানটা অন্ধকার দেখে আমি বললুম, রামহরি, শীগগির লণ্ঠনটা জ্বলো তো।

রামহরি আলো জ্বেলে খাদলের উপরে ধরতেই লোকটা আবার কান্নার স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—'ওরে বাবা রে, প্রাণ যে যায়, একটু জল দাও—একটু জল দাও।

বিমল তাকে টেনে উপরে তুলে, তার মুখ দেখেই বলে উঠল, একে যে আমি করালীর সঙ্গে দেখেছি।

লোকটাও বিমলকে দেখে সভয়ে বললে, আমাকে আর মেরে না, আমি মরতেই বসেছি—আমাকে মেরে আর কোন লাভ নেই।

এতক্ষণে দেখলুম, তার মুখে-বুকে-হাতে-পিঠে বড় বড় রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন —ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ তাকে বার বার আঘাত করেছে।

বিমল বললে, কে তোমার এ দশা করলে?

—করালী।

—করালী?

—হ্যাঁ মশাই, সেই শয়তান করালী।

—কেন সে তোমাকে মারলে?

—সব বলছি, কিন্তু বাবু, তোমার পায়ে পড়ি, আগে একটু জল দাও—তেষ্টায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে?

রামহরি তাড়াতাড়ি তার মুখে জল ঢেলে দিলে। জলপান করে 'আঃ' বলে লোকটা চোখ মুদে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল।

বিমল বললে, এইবার বল, করালী কেন তোমাকে মারলে?

—বলছি বাবু, বলছি। আমি তো আর বঁচিব না, কিন্তু মরবার আগে সব কথাই তোমাদের কাছে বলে যাব। আরো কতক্ষণ চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলতে লাগল, বাবু, তোমাদের পাথর চাপা দিয়ে, করালীবাবু আর আমি তো সেখান থেকে চলে এলুম। যকের ধনের বাক্স করালীবাবুর হাতেই। তারপর এখানে এসে করালীবাবু বললে, তুই কিছু খাবার রান্না কর, কাল সারারাত খাওয়া হয়নি, বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে —আমাদের সঙ্গে চাল-ডাল আর আলু ছিল, বন থেকে কাঠ-কুটো জোগাড় করে এনে আমি খিচুড়া চড়িয়ে দিলুম।...করালীবাবু আগে খেয়ে নিলে, পরে আমি খেতে বসলুম। তারপর

কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ আমার পিঠের ওপরে ভয়ানক একটা চোট লাগল, তখনি আমি চোখে অন্ধকার দেখে চিৎ হয়ে পড়ে গেলুম। তারপর আমার বুকে আর মুখেও ছোরার মতন কি এসে বিধল—আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। কে যে মারলে তা আমি দেখতে পাইনি বটে, কিন্তু করালীবাবু ছাড়া তো এখানে আর জনমুনিষ্যি ছিল না, সে ছাড়া আর কেউ আমাকে মারেনি। বোধহয়, পাছে আমি তার যকের ধনের ভাগীদার হতে চাই, তাই সে এ কাজ করেছে? এই পর্যন্ত বলেই লোকটা বেজায় হাঁপাতে লাগল।

বিমল ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, এ ব্যাপারটা কতক্ষণ আগে হয়েছে?

—তখন বোধহয় বিকেলবেলা।

—করালীর সঙ্গে আর কে আছে?

—কেউ নেই। আমরা পাঁচজন লোক ছিলুম। আসবার মুখেই দুজন তো তোমাদের তাড়া খেয়ে অন্ধকার রাতে ঐ ফাটলে পড়ে পটল তুলেছে। শম্ভুকে সুড়ঙ্গের মধ্যে ভূত না দানো কার মুখে ফেলে ভয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। এইবার আমার পালা, জল —আর একটু জল।

রামহরি আবার তার মুখে জল দিলে, কিন্তু এবারে জল খেয়েই তার চোখ কপালে উঠে গেল।

বিমল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাস করলে, যকের ধনের বাক্সে কি ছিল?

কিন্তু লোকটা আর কোন কথার জবার দিতে পারলে না, তার মুখ দিয়ে গাজল উঠতে লাগল ও জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল; তারপরেই গোটাকতক হেঁচকি তুলে সে একেবারে স্থির হয়ে রইল।

বিমল বললে, যাক, এ আর জন্মের মত কথা কইবে না। এখন চল, করালীকে ধরে তবে অন্য কাজ।

চোখের সামনে একটা লোককে এভাবে মরতে দেখে আমার মনটা অত্যন্ত দমে গেল, আমি আর কোন কথা না বলে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে চললুম

এই ভাবতে ভাবতে যে, পৃথিবীতে করালীর মতন মহাপাষণ্ড আর কেউ আছে কি?

ভীষণ গহ্বর

অল্প-অল্প চাঁদের আলো ফুটেছে, সে আলোতে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না-অন্ধকার ছাড়া। প্রেতলোকের মতন নির্জন পথ। আমাদের পায়ের শব্দে যেন চারিদিকের স্তব্ধতা চমকে চমকে উঠছে। আশপাশের কালি-দিয়ে-আঁকা গাছপালাগুলো মাঝে মাঝে বাতাস লেগে তুলছে আর আমাদের মনে হচ্ছে, থেকে থেকে অন্ধকার যেন তার ডান নাড়া দিচ্ছে ।

আমি বললুম, দেখ বিমল, আমাদের আর এগুনে ঠিক নয়।

—কেন?

—এই অন্ধকারে একলা পথ চলতে করালী নিশ্চয় ভয় পাবে। খুব সম্ভব, সে এখন কোন গুহায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে আর আমরা হয়তো তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাব। তার চেয়ে আপাততঃ আমরাও কোথাও মাথা গুজে কিছু বিশ্রাম করে নি এস, তারপর ভোর হলেই আবার চলতে সুরু করা যাবে।

বিমল বললে, কুমার, তুমি ঠিক বলেছ। করালীকে ধরবার আগ্রহে এসব কথা আমার মনেই ছিল না।

রক্তজবার রঙে-চোবানো উষার প্রথম আলো সবে যখন পূর্বআকাশের ধারে পাড় বুনে দিচ্ছে, আমরা তখন আবার উঠে পথ চলতে শুরু করলুম।

চারিদিকে নানা জাতের পাখিরা মিলে গানের আসর জমিয়ে তুলেছে, গাছের সবুজ পাতারাও যেন কাঁপতে কাঁপতে মর্মর-সুরে সেই গানে যোগ দিয়েছে, আর তার তালে তালে ঝরে পড়ে ঝরনার জল নাচতে নাচতে নীচে নেমে যাচ্ছে। আকাশে বাতাসে পৃথিবীতে কেমন একটি শান্তিভরা আনন্দের আভাস! এরি মধ্যে আমরা কিন্তু আজ হিংসাপূর্ণ আগ্রহে ছুটে চলেছি—এটা ভেবেও আমার মন বার বার কেমন সঙ্কুচিত হয়ে পড়তে লাগল।.

পাহাড়ের পর পাহাড়ের মাথার উপরে সুর্যের মুখ যখন জ্বলন্ত মটকের মতন জেগে উঠল, আমরা তখন পথের একটা বাকের মুখে এসে পড়েছি।

বাঘা এগিয়ে এগিয়ে চলছিল, বাকের মুখে গিয়েই হঠাৎ সে ঘেউ ঘেউ করে চেঁচিয়ে উঠল ।

আমরা সবাই সতর্ক ছিলুম, সে চ্যাঁচালে কেন, দেখবার জন্যে তখনি সকলে ছুটে বাঁকের মুখে গিয়ে দাঁড়ালুম।

দেখলুম, খানিক তফাতে একটা লোক দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে! দেখবামাত্র চিনলুম, সে করালী ! তার হাতে একটা বড় বাক্স—যকের ধন!

আমাদের দেখেই করালী বেগে একদৌড় মারলে—সঙ্গে সঙ্গে বিমলও তীরের মতন তার দিকে ছুটে গেল। আমরা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ছুটতে ছুটতে বিমল একেবারে করালীর কাছে গিয়ে পড়ল। তারপর সে চেঁচিয়ে বললে, করালী, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তবে থামো। নইলে আমি গুলি করে তোমাকে কুকুরের মত মেরে ফেলব। কিন্তু করালী থামলে না, হঠাৎ পথের বাঁ-দিকে একটা উঁচু জায়গায় লাফিয়ে উঠেই অদৃশ্য হয়ে গেল—বিমল সেখানে থমকে দাঁড়াল,—এক মুহূর্তের জন্যে। তারপরেই সেও লাফিয়ে উপরে উঠল, আমরা তাকেও আর দেখতে পেলুম না।

ততক্ষণে আমাদের হুঁস হল—'রামহরি, শীগগির এস' বলেই আমি প্রাণপণে দৌড়ে অগ্রসর হলুম।

সেই উঁচু জায়গাটার কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে একটা গুহার মুখ। আমি একলাফে উপরে উঠতেই একটা বিকট চীৎকার এসে আমার কানের ভিতরে ঢুকল—সঙ্গে সঙ্গে শুনলুম বিমলের কণ্ঠস্বরে উচ্চ আর্তনাদ। তারপরই সব স্তব্ধ।

আমার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করে উঠল—বেগে ছুটে গিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লুম। ভিতরে গিয়ে দেখি কেউ তো সেখানে নেই। অত্যন্ত আশ্চর্য ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

পরমুহূর্তে রামহরিও এসে গুহার মধ্যে ঢুকে বললে, 'কে অমন চেঁচিয়ে উঠল? কৈ, খোকাবাবু কোথায়?

—জানি না রামহরি, আমি শুনলুম গুহার ভেতর থেকে বিমল আর্তনাদ করে উঠল। কিন্তু ভেতরে এসে কারুকেই তো দেখতে পাচ্ছি না?

গুহার একদিকটা আঁধারে ঝাপসা। সেইদিকে গিয়েই রামহরি বলে উঠল, এই যে, ভেতরে আর একটা পথ রয়েছে।

দৌড়ে গিয়ে দেখি, সত্যিই তো! একটা গলির মত পথ ভিতর দিকে চলে গেছে—কিন্তু অন্ধকারে সেখানে একটুও নজর চলে না।

আমি বললুম, রামহরি, শীগগির বিজলী-মশাল বের কর, বন্দুকটা আমাকে দাও।

বন্দুকটা আমার হাতে দিয়ে রামহরি বিজলী-মশাল বার করলে, তারপর সাবধানে ভিতরে গিয়ে ঢুকল। আমিও বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে সতর্ক চোখে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে তার সঙ্গে সঙ্গে চললুম।

উপরে, নীচে, এপাশে, ওপাশে গুহার নিরেট পাথর, তারই ভিতর দিয়ে যেতে যেতে আবার আমার মনে পড়ল, সেই যকের ধনের সুড়ঙ্গের কথা।

আচম্বিতে রামহরি দাঁড়িয়ে পড়ে আঁতকে উঠে বললে, সর্বনাশ।

আমি বললুম, ব্যাপার কি?

রামহরি বললে, সামনেই প্রকাণ্ড একটা গর্ত!

বিজলী-মশালের তীব্র আলোতে দেখলুম, ঠিক রামহরির পায়ের তলাতেই গুহার পথ শেষ হয়ে গেছে, তারপরেই মস্তবড় একটা। অন্ধকার-ভরা ফাঁক যেন হাঁ করে আমাদের গিলতে আসছে। বিমল কি ওরই মধ্যে পড়ে গেছে?

যতটা পারি গলা চড়িয়ে চেঁচিয়ে ডাকলুম, বিমল, বিমল, বিমল?

পৃথিবীর গর্ত থেকে করুণ স্বরে কে যেন সাড়া দিলে—কুমার, কুমার! বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!

গহবরের ধারে লম্ব হয়ে শুয়ে পড়ে রামহরির হাত থেকে বিজলীমশালটা নিয়ে দেখলুম, গর্তের মুখটা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাত চওড়া। তলার দিকে চেয়ে দেখলুম প্রায় ত্রিশ হাত নীচে কি যেন চক্ চক্ করছে! ভালো করে চেয়ে দেখি, জল।

আবার চেঁচিয়ে বললুম, বিমল, কোথায় তুমি?

অনেক নীচে থেকে বিমল বললে, এই যে, জলের ভেতরে। শীগগির আমাকে তোলবার ব্যবস্থা কর ভাই, আমার হাত-পায়ে খিল ধরেছে, এখুনি ডুবে যাব।

—রামহরি, রামহরি! ব্যাগের ভেতর থেকে দড়ির বাণ্ডিল বের কর—জলদি!

রামহরি তখনি পিঠ থেকে বড় ব্যাগটা নামিয়ে খুলতে বসে গেল। আমি বিজলী-মশালটা নীচু-মুখে করে দেখলুম, কালো জলের ভিতরে ঢেউ তুলে বিমল সাঁতার দিচ্ছে।

তাড়াতাড়ি দড়িটা নামিয়ে দিলুম, বিমল সাঁতরে এসে দড়িটা দু-হাতে চেপে ধরলে।

আমি আবার চেঁচিয়ে বললুম, বিমল, দেওয়ালে পা দিয়ে দড়ি বেয়ে তুমি উপরে উঠতে পারবে, না, আমরা তোমায় টেনে তুলব?

বিমলও চেঁচিয়ে বললে, বোধহয় আমি নিজেই উঠতে পারব।

আমি আর রামহরি সজোরে দড়ি ধরে রইলুম, খানিক পরে বিমল নিজেই উপরে এসে উঠল, তারপর আমার কোলের ভিতরে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অজ্ঞান হয়ে গেল ।

আমরা দুজনে তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এলুম।

পরিণাম

বিমলের জ্ঞান হলে পর আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে তুমি গর্তের মধ্যে গিয়ে পড়লে?

বিমল বললে, করালীর পিছনে পিছনে যেই আমি গুহার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম, সে অমনি ঐ অন্ধকার গলির মধ্যে সেঁধিয়ে পড়ল। আমিও ছাড়লুম না, গলির ভিতরে ঢুকে সেই অন্ধকারেই আমি তাকে জড়িয়ে ধরলুম, তারপর দুজনের ধস্তাধস্তি শুরু হল। কিন্তু আমরা কেউ জানতুম না যে, ওখানে আবার একটা গহ্বর আছে, ঠেলাঠেলি জড়াজড়ি করতে করতে দুজনেই হঠাৎ তার ভেতরে পড়ে গেলুম।

আমি শিউরে বলে উঠলুম, অ্যাঁঃ! করালী তাহলে এখনো গহ্বরের মধ্যে আছে?

—হ্যাঁ কিন্তু বেঁচে নেই।

—সে কি?

—যদিও অন্ধকারে সেখানে চোখ চলে না, তবু আমি নিশ্চয়ই বলতে পারি, সে ডুবে মরেছে। কারণ, আমরা জলে পড়বার পর ঠিক আমার পাশেই দু-চারবার ঝপাঝপ, শব্দ হয়েই সব চুপ হয়ে গেল। নিশ্চয়ই সে সাতার জানত না, জানলে জলের ভেতরে শব্দ হত।

আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলুম, আর যকের ধনের বাক্সটা?

বিমল একটা বিষাদ-ভরা হাসি হেসে মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, আমি যখন করালীকে জড়িয়ে ধরি, তখনে সে বাক্সটা ছাড়েনি। আমার বিশ্বাস, বাক্সট নিয়েই সে জলপথে পরলোকে যাত্রা করেছে।

—"কিন্তু বাক্সটা যদি গলির ভেতরে পড়ে থাকে? বলেই আমি বিজলী-মশালটা নিয়ে আবার গুহার ভিতরকার গলির মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম। কিন্তু মিছে আশা, সেখানে বাক্সের চিহ্নমাত্রও নেই। আর একবার সেই বিরাট গহ্বরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলুম, অনেক নীচে অন্ধকার-মাখা-জলরাশি মৃতের মতন স্থির ও স্তব্ধ হয়ে আছে, এই একটু আগেই সে যে একটা মানুষের প্রাণ ও সাত-রাজার ধনকে নিষ্ঠুরভাবে গ্রাস করে ফেলেছে, তাকে দেখে এখন আর সে সন্দেহ করবারও উপায় নেই।

হতাশভাবে বাইরে এসে অবসন্নের মতন বসে পড়লুম। বিমল শুধোলে, কেমন, পেলে না তো?

মাথা নেড়ে নীরবে জানালুম—না।

—তা আমি আগেই জানি। করালী প্রাণে মরেছে বটে, কিন্তু যকের ধন ছাড়েনি। শেষ জিৎ তারই।

স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম। দুঃখে, ক্ষোভে, বিরক্তিতে মনটা আমার ভরে উঠল; এত বিপদ, এত কষ্টভোগের পর এতবড় নিরাশ! আমার ডাক-ছেড়ে কাঁদবার ইচ্ছা হতে লাগল।

বিমলও হতাশভাবে মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইল। অনেকক্ষণ পরে রামহরি বললে, তোমরা দুজনে অমন মন-মরা হয়ে থাকলে তো চলবে না। যকের ধন ভাগ্যেই নেই তাতে হয়েছে কি?

প্রাণে বেঁচেছ এই ঢের। যা হাতে না আসতেই অত বিপদ, এত ঝঞ্ঝাট, যার জন্যে এতগুলো প্রাণ গেল, তা পেলে না জানি আরো কত মুস্কিলই হত! এখন ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে চল।

বিমল মাথা তুলে হেসে বললে, ঠিক বলেছ রামহরি। আঙুর যখন নাগালের বাইরে, তখন তাকে তেতো বলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া যাক। যকের ধন কি মানুষের ভোগে লাগে? করালী ভূত হয়ে চিরকাল তা ভোগ করুক—

দরকার নেই আর তার জন্যে মাথা ঘামিয়ে। আপাততঃ বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, কুমার! তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ, পাখিটাখি কিছু মারতে পারো কি না। ততক্ষণে রামহরি ভাত চড়িয়ে দিক, আর আমি ওষুধ মালিস করে গায়ের ব্যথা দূর করি।

আমি বললুম, কাজেই।

বিমল বললে, 'আহারের পর নিদ্রা, তারপর দুর্গা বলে স্বদেশের দিকে যাত্রা, কি বল?

আমি বললুম, অগত্যা।